সবার মা সারদা

শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত

পরিবেশক—
অনির্ব্বাণ প্রকাশনী
৩এ, গঙ্গাধরবাবু লেন
কলিকাতা-১২

প্রকাশিকা :
মায়া চক্রবর্ত্তী
ওল্ড ক্যালকাটা রোড
রহড়া, ২৪ পরগণা

প্রথম মুদ্রন :
বৈশাখ, ১৩৭০

মুদ্রক :
প্রিণ্টার্স ডিও প্রেসিয়াস্
১৫নং পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
শ্রীসুনীল কুমার ভট্টাচার্য্য

ভূমিকা

তন্দ্রাগ্রস্ত শতাব্দী। পাশ্চাত্য-সভ্যতার রাহুগ্রাসে ভারতাত্মা আচ্ছন্ন। জাতির জীবনে ঘোর শঙ্কট। তারা বিস্মৃত হতে বসল তাদের নিজেদের পরিচয়। উনবিংশ শতাব্দীর আশীর্বাদ উপেক্ষা করে তারা ছুটল পরধর্ম ও পরানুকরণের দিকে।

জাতিকে এ অভিশাপ থেকে কে রক্ষা করবে? কে ফেরাবে যুগ ও জীবনকে এ অবক্ষয় থেকে?

মুক্তিযজ্ঞের প্রথম পুরোহিত রূপে আবির্ভূত হলেন রামমোহন। হিন্দুধর্মের অথৈ সমুদ্র থেকে তুলে আনলেন ব্রাহ্মধর্মের পতাকা। জাতি একটু থমকে দাঁড়াল বটে, কিন্তু পুরোপুরি ভাবে গ্রহণ করতে পারলনা তা। বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ ও শিবনাথ এলেন। যুগ ও জীবনের প্রেক্ষাপটে এসব দিগ্‌পালদের আগমন দেখে গোঁড়া হিন্দু সমাজ আরো দৃঢ় করে দাঁড় করাল তাদের বিজয় তরণী। এগিয়ে যেতে লাগল তরতর করে। ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যেও দেখা দিল আত্মকলহ। নব নাগরিক সভ্যতার পীঠভূমি কলকাতা হয়ে উঠল রণক্ষেত্র। ঠিক এমনি দিনে দক্ষিণেশ্বর থেকে ধ্বনিত হল আহ্বান, 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়।'

—কে? কে এমন মমতা মধুর কণ্ঠে আহ্বান করছেন?

রাণী রাসমণির কালীমন্দিরের পূজারী গদাধর ঠাকুর। সিমলার নরেন দত্তর মনেও জাগাল সাড়া। বাংলার বুকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগ সঞ্চার হল।

শিব-প্রীতির সঙ্গে শক্তির আবির্ভাব না হয়ে পারে? তাইতো এলেন বিশ্বজননী সারদামণি।

সারদা পরমাশক্তির ঘনিভূত মূর্তি। রামকৃষ্ণ সংহিতার বেদ সঙ্গিত।

অনেক পুস্তক মা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। বহু শ্রদ্ধেয় লেখকের অর্ঘ্য স্বরূপ নিবেদিত হয়েছে মায়ের জীবনী। তবুও কেন লিখি? কারণ সুধাসিন্ধু ফুরোয় না। এ নেশাও জুরোয় না। অমৃত কথনের কি অন্ত আছে? না শেষ আছে? এ যে অশেষ। অফুরন্ত। জীবনের কোনো এক মগ্নমুহূর্তে যদি এই সময়টুকু একান্ত নিজের করে নেওয়া যায়, তবেই পরম লাভ। সে লাভের বৃন্তে প্রস্ফুটিত হয়ে আছে একটি মন্ত্র—'মা'।

মা নাম জপে যদি তন্ময়তা আসে তবেই সিদ্ধি। তবেই পরম শান্তি। আমিও সেই শান্তি পিপাসু ছাড়া কিছু নয়। মাতৃনাম জপ করলাম।

মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত

এক

মা যদি করুণাময়ী, আমি কেন কোলছাড়া ?

গণ্ডগ্রাম জয়রাম বাটী।

চারিদিকে সবুজের অরণ্য। পাখীর ডাকে গ্রামের ঘুম ভাঙ্গে।

পথে লোক নামে। যে যার কর্মে নিয়োজিত হয়।

ঘুম ভাঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের।

দুটি কর যুক্ত করে রাখেন ললাটে। মাকে স্মরণ করেন মনে মনে। আনন্দ নেই ক্ষণিকের জন্যও। শুধু দীর্ঘশ্বাস আর হতাশা। শুধু ভাবনা আর দুশ্চিন্তা। সংসার চলেনা। অভাবে, অনটনে দীর্ণ বিদীর্ণ অন্তর। আর কতকাল এ নির্যাতন সহ্য করা যায়! তাইতো রামচন্দ্র দিবস রজনী একই ভাবনায় যুক্ত। একই চিন্তায় রিক্ত। মাঝে মাঝে অভিমানে ফেটে পড়েন তিনি। অভিযোগ করেন অদৃশ্য শক্তির কাছে—তুমি যদি করুণাময়ী, তবে আমি কেন তোমার কোল ছাড়া হয়ে থাকি ?

পরমুহূর্তেই অন্য ভাবনা মনকে ধরে একটা নাড়া দেয়—না-না, ও কি কথা! সুখে তোমার অভয়স্পর্শ, দুঃখে নেই কি তোমার করুণার ফল্গুধারা ? আনন্দে তোমার ভুবনমোহিনী রূপ, আবার বেদনায় তো তুমিই স্নেহময়ী জননী। সুখেও তুমি, দুঃখেও তুমি। স্বভাবেও তুমি, অভাবেও তুমি। তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি, এমন সাধ্য কৈ আমার!

এমনি ভাবনা ভাবছিলেন সেদিনও।

চিন্তার ক্লান্তি চেতনাকে ফেলল আচ্ছন্ন করে। সহসা নিদ্রা নেমে এল নয়নে। ঘুমিয়ে পড়লেন রামচন্দ্র।

এ কি ঘুম?

না।

তবে?

ঊষা উন্মেষের আঁধার।

ভোর হবার আগে আকাশটা একবার অন্ধকার হয়ে যায়।

তার পরেই পূর্ণ প্রভাত। প্রসন্নতার প্রাণোচ্ছলতা।

রামচন্দ্র দেখছেন—

ছোট্ট একটি মেয়ে। কত আর বয়স হবে! পাঁচ ছয়। নিটোল নিখুঁত।

সোনারবরণ অঙ্গ। নয়নে নয়নে স্নিগ্ধ দীপ্তি। মূল্যবান গহনায় কচি হাত দুটি ঢাকা। ধীরে ধীরে আসছেন এগিয়ে। একেবারে রামচন্দ্রের কাছে। শুধু কি তাই? রামচন্দ্রের পিঠে বুক ঠেকিয়ে কচি কচি হাত দুখানা দিয়ে ধরলেন ব্রাহ্মণের গলাটি জড়িয়ে।

দুলছেন আর দুলছেন!

রামচন্দ্রের বিস্ময় লাগল। কেন যেন ভক্তি আর ভালবাসায় অন্তরটা ভরে উঠল। স্নেহমাখা কণ্ঠে শুধালেন রামচন্দ্র—

তুমি কে গা?

হাসি মাখা আধো-আধো কণ্ঠে মেয়েটি বললেন,

'এই আমি তোমার কাছে এলুম'।

ব্যগ্র ব্যাকুল দুটি বাহু প্রসারিত করলেন রামচন্দ্র। মেয়েটিকে বুকে জাপটে ধরতে হলেন উদ্যত। ঘুম গেল ভেঙ্গে। উঠে বসলেন। আকুল কণ্ঠে বলতে লাগলেন—কৈ গো তুমি? কোথায় গেলে হারিয়ে? যদি এলেই তবে চলে গেলে কেন?

কেটে যায় স্বপ্নের ঘোর। স্বেদ-সিক্ত ব্রাহ্মণের অঙ্গ। চোখে

সন্ধানী দৃষ্টি। মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। কর্ণে তখনও যেন শুনতে পাচ্ছেন —'এই আমি তোমার কাছে এলুম'।

আবার সেই ব্যাকুল কান্না—কৈ গো কোথায় তুমি? কোথায় গেলে হারিয়ে?

পাশের ঘরে বসে পড়াশুনা করছেন অনুজ নীলমাধব। দাদার কান্না করুণ কণ্ঠ শুনে খাড়া করলেন কান। হ্যাঁ, ঠিক দাদার গলা। পড়া ছেড়ে উঠে পড়লেন। ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন, শুধালেন—কি গো দাদা! কি হয়েছে তোমার?

সহসা চমকে ওঠেন রামচন্দ্র—এ্যাঁ! কে, কে নীলু?

না না। কিছু না। কিছু হয়নি নীলু!

তখনো সহজ হতে পারেননি রামচন্দ্র।

—তুমি এমন করছ কেন? কি হয়েছে তোমার দাদা?

নীলু নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

একটু স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করলেন রামচন্দ্র। নীলমাধব হাওয়া করতে লাগলেন দাদাকে। ক্ষণকাল নীরব থেকে বলতে লাগলেন রামচন্দ্র—একটা স্বপ্ন দেখছিলুম নীলু!

—ভয়ের বুঝি?

—নারে, ভয়ের কিছু নয়। তুই একটা কাজ কর নীলু!

—কি দাদা?

—কাল তুই শিহড় চলে যা। তোর বৌঠানকে নিয়ে আয় গে।

—কেন, তোমার শরীর কিছু······

—নারে না। শরীরের কিছু হয়নি। ভাবছি একবার কলকাতায় যাব।

পাশের গ্রাম শিহড়। রামচন্দ্রের শ্বশুরালয়। স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী কয়েকদিন হল গিয়েছেন বাপের বাড়ী। তাকে যেন একান্ত দরকার! এমন মধুর স্বপ্ন, কি করে গোপন রাখবেন শ্যামাসুন্দরীকে না বলে?

এ যে অলৌকিক। অদ্ভুত। অপূর্ব!

নীলু বললেন—বেশ, তাহলে কাল সকালেই চলে যাই বৌঠানকে আনতে?

রামচন্দ্র বললেন-হ্যাঁ, তাই করিস। কালই চলে যাস।

যা, এখন শুয়ে পড় গে।

এমন মধুর স্বপ্ন! তুমি সত্যি হয়ে এস আমার ঘরে। যে উৎকণ্ঠা উদ্বেগের আগুন তুমি বুকে জ্বালিয়েছ, তোমার করুণার নির্ঝরে তা প্রশমিত কর। আবদ্ধ কর তোমার স্নেহকর বন্ধনে। মাগো, তুমি করুণাময়ী। আমাকে বঞ্চনার বেদনায় ম্লান করে দিওনা।

সারাটা রাত কেটে গেল—প্রার্থনা আর ক্রন্দনে। ভোর হল। নীলমাধব যাত্রা করলেন শিহড়ের পথে।

দুই

শিহড় গ্রাম।

পথ আর পথ।

হাটছেন শ্যামা দেবী। সঙ্গে রয়েছেন বৃদ্ধা মা। যাবেন শিব মন্দিরে পূজো দিতে।

এক সময়ে এসে পৌঁছে গেলেন মন্দিরে। পূজো দিলেন। ভক্তি-বিনম্র হয়ে নমস্কার করলেন। চরণামৃত, আশীর্বাদ এবং প্রসাদ নিয়ে পথে নামলেন। চলতে চলতে হঠাৎ বললেন শ্যামাদেবীর মা —তুই বাড়ি যা শ্যামা। হৃদয়ের মাকে আমি 'চন্নামৃতটুকু' দিয়ে আসি।

আর দ্বিরুক্তি নয়। শ্যামা দেবী একাকী চললেন বাড়ির দিকে। মা চললেন অন্যপথে।

চির পরিচিত পথ। তাই কোন কষ্ট হচ্ছেনা এগিয়ে যেতে। তাছাড়া শ্যামাদেবীর বাড়ির পথে রয়েছে একটি বিল্ববৃক্ষ। ওটি হল ওঁদের পথের নিশানা। শিশুকাল থেকে এ গাছের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত। শিব মন্দিরে যাবার পথে এই বেল গাছ থেকেই শিব পূজোর বেলপাতা তুলে নিয়ে ছিলেন শ্যামা দেবী। আজ হাটতে হাটতে সহসা পায়ের ছন্দ মন্থর হল। থমকে দাঁড়ালেন শ্যামা দেবী। উৎকর্ণ হয়ে তাকাচ্ছেন। অদূরে বেল গাছ। কে যেন খিল খিল করে হাসছে। শ্যামাদেবীর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তাকালেন বেল গাছের পানে। বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল আঁখি। শ্বাস বইতে লাগল ঘন ঘন। স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকেন শ্যামাদেবী। অবলোকন করেন জাগ্রত নয়নে কি যেন।

কে, কে তুমি!

ছোট্ট সুন্দর একটি মেয়ে।

সুঠাম অঙ্গে লাল চেলী। স্নিগ্ধ মধুর রূপ। কোন মানবীর দেহে এত রূপ, এত সৌন্দর্য থাকে।

অপলক শ্যামাদেবী।

কে গা তুমি? কোথায় পেলে এরূপ? দু-পাঁচ দশ গাঁয়েও তো দেখিনি তোমাকে কোন দিন! তুমি কে? কোত্থেকে এলে? আহা-হা!

শিউরে উঠলেন শ্যামাদেবী। মেয়েটি বেল গাছের একটি ডাল ধরে ঝুলছে। আর ফিক ফিক করে হাসছে। কখনো বা খিল খিল শব্দে।

ভয়ে শ্যামাদেবীর বুকের মধ্যে দুরু দুরু করে উঠে! কণ্ঠ শুকিয়ে যায়। হাত পা থর থর করে কাঁপে।

অমন করে ঝুলনা। তুমি যে পড়ে যাবে!

এদিক ওদিক তাকান শ্যামাদেবী। কাউকে খোঁজেন। উদ্বিগ্ন

উৎকণ্ঠায় অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন তিনি। কি করবেন দিশে পান না।

সহসা টুপ করে নেমে পড়ল মেয়েটি। তার চরণ ছন্দে নূপুর নিক্কণ। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। একেবারে শ্যামাদেবীর কাছে। দাঁড়ায় মুখোমুখি। চোখে চোখ পড়তেই ফিক করে হেসে ফেলে। দুটি স্নেহমাখা হাত বাড়িয়ে দেন শ্যামাদেবী। বড় সাধ ওকে একবার বুকের মধ্যে জাপটে ধরতে। মেয়েটিও প্রসারিত করে দিল দুটি কনক বাহু। বলল মধুর কণ্ঠে, 'এই' আমি তোমার কাছে এলাম।'

'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো'—

মধুক্ষরা কণ্ঠটি শ্যামাসুন্দরীর অন্তরকে স্পর্শ করল। আকুল প্রাণে ব্যাকুল হয়ে শিশুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন শ্যামাদেবী মেয়েটির পানে। মেয়ের সর্ব অঙ্গে আলোর ঝর্ণা। দিব্য কান্তি। প্রাণ হরণ আকর্ষণ। সেই আলোর প্লাবন এসে শ্যামাসুন্দরীকে ডুবিয়ে দিল। এক রকম সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন তিনি। লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। দিব্য আলোক রশ্মির মধ্যে মিলিয়ে যায় মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে তারই মধ্য থেকে উত্থিত হয় একটি দীপ্ত কুণ্ডলী। আবর্তিত হতে থাকে প্রবল বেগে। অবশেষে হাওয়ার সঙ্গে দুলতে দুলতে এসে প্রবেশ করে শ্যামাসুন্দরীর দেহে। এ তড়িৎ প্রবাহের গতি তীব্র। কিন্তু দীপ্তি স্নিগ্ধ।

তুমি অক্ষয়। তুমি অব্যয়। তুমি অনন্ত। তুমি সনাতনী। ব্রহ্মময়ী শক্তিভূতা। অত বিরাট হয়ে এলে আমি কি করে তোমাকে ধরতে পারতাম। তাইতো ছোট হয়ে এলে। কন্যা বেশে মায়ের অঙ্কে। যদি এতই দয়া, তবে কেন মুহূর্তে মিলিয়ে গেলে? আমি যে তোমাকে না দেখে থাকতে পারছিনে। দয়াময়ী দয়া কর। জুড়িয়ে দাও আমার তৃষিত বক্ষের মরুমূর্ছনা। শ্যামাসুন্দরীর দিবস শর্বরীর এই একটি প্রার্থনা। এই একটি কান্না।

বসে আছেন ঘরের বারান্দায়—

বসে আছে শ্যামাসুন্দরী এবং তাঁর মা।

অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন জননী মেয়ের পানে! শুনছেন উৎকর্ণ হয়ে শ্যামাসুন্দরীর মুখে বেলতলার সেই অপূর্ব কাহিনী। বলতে বলতে এক সময়ে থেমে গেলেন শ্যামা দেবী।

মা বললেন—কি ভাবছিস?

শ্যামাদেবী বললেন—আমাকে জয়রামবাটী পাঠিয়ে দাও মা। আজই চলে যাই। দাদাকে বল দিয়ে আসুন। শ্যামাদেবীর মা আপত্তি করলেন—এমন দুর্বল শরীর নিয়ে কি করে তুই যাবি? একটু আগেই না মাথা ঘুরে পড়ে গেলি? থাক আর কয়েকটা দিন। একটু সুস্থ হয়ে নে। তার পরে চলে যাস।

কিন্তু না! আর মন থাকতে চাইছে না। ছটফট করছে। এমন মধুর আবেশ ওঁর কাছে নিবেদন না করে শান্তি নেই। তাই বললেন শ্যামাসুন্দরী—তুমি একটুও ভেবনা মা। আমি ঠিক চলে যেতে পারব। শরীর কিছু খারাপ করবে না। তুমি দাদাকে বল।

চিন্তামণি চিন্তা দেন, আবার চিন্তা দূরও করেন। ওঁদের কথায় সহসা ছেদ পড়ল। সামনে এসে দাঁড়াল হৃদয়রাম। হাতে মস্ত একটা ধামা। সঙ্গে ছোট্ট একটা বাটিও রয়েছে। সকালে শ্যামা-দেবীর মা ওদের বাড়িতেই গিয়েছিলেন চরণামৃত দিতে। হৃদয়রাম মুখুজ্যে এই গ্রামেরই ছেলে। হাটে গিয়েছিল। বাড়িফেরার পথে দিতে এসেছে চরণামৃতের বাটি।—তা বেশ করেছিস। ওখানে রেখে দে।

এমনি সময়ে শ্যামাসুন্দরীর দাদা ডাকলেন মাকে—মা, ওমা! এই দেখ কাকে ধরে এনেছি।

শ্যামাসুন্দরী ও তাঁর মা তাকালেন ফিরে। নীলমাধব এসেছে। বললেন শ্যামাদেবীর মা—এসো নীলু। বসো। খবর সব ভাল তো?

নীলমাধব বলেন—হ্যাঁ। আপনারা ভাল আছেন তো মা ঐ মা ?

—এই চলে যাচ্ছে বাবা।

পুত্র জানালেন মাকে নীলমাধবের আগমনের কারণটি। মায়ের চোখ দুটি ওঠে সজল হয়ে। তাকালেন তিনি মেয়ের পানে। শ্যামা-সুন্দরী বলে ওঠেন—ভালই হল মা।

ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস শ্যামাদেবীর মার বুকের পাঁজর ঠেলে বেরিয়ে এল। বললেন তিনি—ওরে শ্যামা, নীলুর হাত মুখ ধোয়ার জল এনে দে।

শ্যামাসুন্দরী বললেন—চলো ঠাকুরপো। হাতমুখ ধুয়ে নেও। আমিও যাব যাব করছিলাম। তুমি এসে ভালই করেছ।

চলে এলেন শ্যামাদেবী। এলেন স্বামী-সান্নিধ্যে।

সেদিন জয়রামবাটীর ঘরে বসে শ্যামাদেবী বলছিলেন তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শনের সংবাদ। নীরবে বসে শুনছিলেন রামচন্দ্র। শুনতে শুনতে সহসা বলে উঠলেন—তা হ'লে তুমিও দেখেছ !

উভয়ের দর্শন বৃত্তান্ত শুনলেন উভয়ে। ভক্তিতে ভালবাসায় অন্তর হ'ল আপ্লুত। নয়নে এল প্রেমাশ্রু। আহা সে কি রূপ! সে কি আকর্ষণ! মানবী বেশে দেবী এসেছিলেন। বুঝলে বৌ, ঐ অলৌকিক। ঐশ্বরিক। তা না হ'লে এমন হয় না।

রামচন্দ্র প্রত্যয়ে প্রবুদ্ধ। তাঁকে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায় অধীর। —দেখা যখন দিয়েছিস, তখন আর বিলম্ব কেন? আয় মা, আয় আমার ঘরে আয়। এ মরু-মধ্যাহ্নে বর্ষণ কর তোর করুণার স্নেহ-বারি।

দিন কাটে। রাত আসে। শ্যামাসুন্দরীর ঘটে দৈহিক পরিবর্তন। তাঁর দেহে ফিরে আসে রূপ আর যৌবন। সৌন্দর্যের দ্যুতি বিচ্ছুরণ হয়। রামচন্দ্র অবাক বিস্ময়ে দেখেন। কত কিছু ভাবেন। অপেক্ষায়

থাকেন শুভ দিনটির। সেই পাঁচ বছরের মেয়ের কণ্ঠ যেন তাঁকে উন্মনা করে তোলে, 'এই আমি তোমার কাছে এলাম।'

সেই সৌভাগ্যের শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় স্বামী স্ত্রী দুজনেই যেন পুজার থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

সেদিন দুজনে বসে কথা বলছিলেন নিবিষ্ট মনে। বলছিলেন ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে। একসময়ে এসে দাঁড়ালেন শ্যামাসুন্দরী জানালার ধারে। তাকিয়ে রইলেন দিগন্তের পানে। তন্ময় দৃষ্টি। হঠাৎ এসে রামচন্দ্র দাঁড়ালেন সম্মুখে। কোনো খেয়াল নেই শ্যামাসুন্দরীর। অবশেষে বললেন তিনি—কি দেখছ তুমি ?

চমকে ওঠেন শ্যামাদেবী—অ্যাঃ! শুনতে পাচ্ছ না তুমি ?

—কি শুনব ?

—নূপুর নিক্কণ! চারি দিকে শুধু নূপুরের ধ্বনি শুনছি। আমাকে ঘিরে অবিরাম বেজে চলেছে। তুমি শুনতে পাচ্ছনা ?

অসহায়ের মত দুটি চোখ তুলে তাকিয়ে থাকেন স্বামীর মুখের পানে।

আঁখির পাতা মুদে আসে রামচন্দ্রের। বিনম্র প্রণাম। ভক্তিতে দ্রবীভূত অন্তর। স্মরণ কর। স্মরণ কর সেই করুণাময়ীকে। তিনি তোমায় সব দুঃখ দূর করে দেবেন। মুছে দেবেন তোমার আকুল কান্নার অশ্রু।

তিন

পৌষ মাস।

শীতের সন্ধ্যা।

কৃষ্ণাসপ্তমীর চাঁদ এখনো ওঠেনি আকাশে। হিমেল হাওয়া। নেই ঘন নিঃস্বন। স্তব্ধ, শান্ত চতুর্দিক। পুষ্পে পত্রে শাখায় পল্লবে নেমেছে শীত-শান্ত নির্জীবতা। তৃণে তৃণে শিশিরের সিক্ততা। গাঁয়ের সন্ধ্যা। তাই নিঝুম নিথর চতুর্দিক। কেবল পশ্চিমের আকাশে দপ দপ্ করে জ্বলছে একটি তারা।

একেই নাকি বলে সন্ধ্যাতারা। ও যেন অন্ধকারের সাগর শিয়রে একটি উজ্জ্বল দীপ শিখা।

বৃহস্পতিবার।

লোকে বলে লক্ষ্মীবার। ঘরে ঘরে পূজো হচ্ছে। বেজে উঠেছে শঙ্খ। হুলুধ্বনিতে মুখর আদিগন্ত। তুলসী মঞ্চে কুলবধূ জ্বেলে দিচ্ছে তেলের প্রদীপ। বৈষ্ণবী আপন মনে গান গাইছে একতারা বাজিয়ে। নিজের সুরে নিজেই তন্ময় বৈষ্ণবী। অশ্রুস্তিমিত নয়নে তাকিয়ে আছে তার আরাধ্য দেবতার পটের পানে। সুর ধৈবত থেকে ক্রমে উঠে এল গান্ধারে।

—দিদি। ও দিদি!

সহসা একি হল। স্তব্ধ হয়ে গেল কণ্ঠস্বর। জিজ্ঞাসু নয়নে তাকাল বৈষ্ণবী।

—ও দিদি, চল। যাবিনে দেখতে?

—কি রে ?

—বামুনমার স্বপ্ন সত্য হয়েছে। মেয়ে হয়েছে গা। চল দিদি একবারটি দেখে আসি গে। সবাই যাচ্ছে। চল আমরাও যাই।

হাতের একতারা হাতেই রইল। ছুটে চললো দুটি বোন। দেবী দর্শনে তীর্থ যাত্রীর অভিসার। ওরা পথ চলছে। আর গান গাইছে। আনন্দে ভেসে ভেসে আনন্দময়ীর কাছে যাচ্ছে।

লক্ষ্মীবারের পুণ্য সন্ধ্যায় শ্যামাসুন্দরীর ঘরে এল সারদা। রামচন্দ্রের আনন্দ আর ধরে না।

এসো—এসো তোমরা সবাই এসো। আনন্দের ভোজে সকলের আমন্ত্রণ। কেউ যেন না বঞ্চিত হয়। এসো, দেখে যাও আমার জননী করুণাময়ীকে। বিশ্ববেদনায় ক্রন্দসী জননী। নেমে এসেছে দেবলোক থেকে মর্ত্তের ঘরে। মাটির পৃথিবীতে।

ওরা এসে দাঁড়াল থমকে।

শুধু কি দাঁড়িয়েই ক্ষান্ত ?

না।

তবে ?

প্রসূতির ঘরের দ্বারে গেল এগিয়ে। তাকাল অপলক নয়নে। আহা কি রূপ। নয়ন হরণ কান্তি। প্রাণ-শান্ত তনু। এতো মেয়ে নয়—মহামায়া। কন্যা নয়—কল্যাণী। করুণাময়ীকে দেখেই অন্তর বিদারণ আর্তি—তুমি এসো আমার ঘরে। রামচন্দ্রের মন উছলে ওঠে আনন্দে, 'লক্ষ্মীবারের পূণ্য সন্ধ্যায় এ কে এলো আমার ঘরে ?'

তবে কি ! তবে কি ! আমার স্বপ্ন সার্থক হল ? সত্যি এলি তুই মা। এলি কি কন্যা বেশে আমার ঘরে ?

শুধু রামচন্দ্র কেন ?

এ প্রশ্ন শ্যামাসুন্দরীকেও করল আন্দোলিত। তার কানে

বাজে সেই মধুবর্ষী কণ্ঠ। আর সেই নূপুর নিক্কণের রুম্ রুম্ ঝুম্ ঝুম্ শব্দ।

আয় মা। আয় আমার স্নেহ-শান্ত অন্তরে। তোকে রাখব আমি আমার আবক্ষ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে। দুঃখের সংসারে এসেছিস বলে কষ্ট দেবনা। আমার বুকের স্তনে নিবৃত্ত করব তোর ক্ষুধা।

বারোশো ষাট সালের ৮ই পৌষ।

বৃহস্পতিবার। কৃষ্ণাসপ্তমীর আঁধার ভেদি এলো আলোর উদ্ভাস। এলো সারদামণি।

কে এই সারদা?

সারদা সাযুজ্যা। মানে, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্তা। ঘরের মেয়ে। ঘরে থাকে। সব কর্ম্মে সারদার কর-স্পর্শ। হাতে কাজ করে। কিন্তু মন ফেলে রাখে সার বস্তুতে। তাঁকে ধরে থাকো। সুখে, দুঃখে, আনন্দে, বেদনায় তাঁকে সঙ্গী করে লও। সব দায় দায়িত্বের বোঝাটা তাঁর পায়ের কাছে ফেলে রাখ। 'তবেই' কিস্তি মাৎ। তোমার সব কিছু তিনিই বহন করবেন। তুমি কেবল মায়ের কোলে অবোধ শিশুটির মত শুয়ে থাকো। আর তাঁর নামটি নিরন্তর বহন কর অন্তরে। মা তাঁর স্তনামৃতে তোমার সব ক্ষুধা জুড়িয়ে দেবেন। তুমি আকণ্ঠ পান করবে।

কোথায় সে উৎসঙ্গ?

ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে মায়ের কোল। মায়ের অভয় অঙ্ক।

আমিও শুয়ে আছি তাঁর কোলে মাথা দিয়ে।

সে কোলে ভয় সেই। শঙ্কা নেই। কলঙ্ক নেই।

আছে আনন্দ। আর আছে অশেষ আশ্রয়।

মায়ের পদপাত হয়নি এমন মাটি কৈ পৃথিবীতে? তাঁর স্পর্শ পায়নি এমন কি আছে ভুবনে? তিনি যে ভুবনমোহিনী। ঐশ্বর্য-শালিনী। তাঁর রূপে বিশ্ব বিমুগ্ধা। তাঁর ঐশ্বর্যে প্রকৃতি গর্বিনী।

আমি তো সেই মায়েরই কোলের ছেলে।

আমার জাগরণে জননী। আমার ঘুমে জননী। আমার ভ্রান্তিতে জননী। আবার প্রত্যয়েও জননী।

তিনি যে আমার সবকিছু জুড়ে বসে আছেন।

আমার আক্ষেপে, বিক্ষেপে, কান্নায়, চাঞ্চল্যে, আশ্বাসে, সান্ত্বনায়, আলোকে, আঁধারে—সর্বত্র তাঁর সুমঙ্গল দৃষ্টি। সর্বত্র তাঁর অভয় প্রহরণ।

আমার জন্মে তোমার চোখে ঘুম নেই। তোমাকে যখনই ডাক দেই তখনই এসে দাঁড়াও। তাই বুঝি তোমার করুণাময়ী নাম। আমি গায়ে যত ধূলোই মাখি, তুমি তা ঝেড়ে কোলে টেনে নাও। আমার জন্য পেতে রেখেছ তুমি তোমার নির্ভয়, নিষ্কলঙ্ক অঙ্ক।

প্রয়োজনের নদীটা খরস্রোতা।

প্রাপ্তির দিগন্তে সাহারার হাহাকার।

বড় অভাব সংসারে। জমির ফসলের পানে তাকিয়ে থাকতে হয় সারাটা বছর। ঐ তো ভরসা। যা উঠবে তা থেকে চললেও ভাল না চললেও আর কিছু আসবে না। তাই তো কত কষ্টে, ক্লিষ্টে চলে রাম মুখুজ্যের সংসার। তা বলে এতটুকু ভ্রূ-কুঞ্চন নেই। নেই স্খলন বর্জ্জন বা অবিশ্বাসের অন্ধকার।

দুঃখের সমুদ্র শিয়রে এ যেন অতন্দ্র প্রহরী। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার পানে আঁখি অপলক। শুধু অন্নের ক্ষুধা নিয়ে নেই রামচন্দ্র। জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দের ক্ষুধায় তিনি কাতর। পেট ভরলেই কি অন্তর ভরে? অন্তরের অন্য ক্ষুধা। সে ক্ষুধা সুধার। সে ক্ষুধা সুন্দরের। সে ক্ষুধা আনন্দের। মা যে তাঁর কাছে ক্ষুধা রূপে সংস্থিতা। চিরন্তনের ক্ষুধামূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে। কোষে কোষে ক্ষুধা। পঞ্চ কোষে পঞ্চ ক্ষুধা। এত ক্ষুধার নিবৃত্তি করবে কে? কে করবে তাঁর তুষ্টি বিধান?

যিনি ক্ষুধা দেন, তিনি আবার করেন তার নিবৃত্তি। মাগো,

আমি তোর ক্ষুধিত পুত্র বলে তুই প্রকাশিতা হয়েছিস অন্নদায়িনী বসুন্ধরা রূপে। চোখের সামনে মেলে দিয়েছিস অন্ন সত্র।

আমি তোর বাগানের দিন মজুর। তোর পূজোব পুরোতঠাকুর। আমি মত্ত হয়ে থাকি। অন্তরে তোর মূর্তি আঁকি। তোকে দেখবার জন্য আঁখি মেলি। প্রদীপ্ত আশায় প্রতীক্ষার আলো জ্বালি। তোর পায়ের কাছে পড়ে থাকতেই আমার আনন্দ। ঐ তো আমার প্রথম ও শেষ কাজ। আমি বিপ্রলব্ধার মত দাঁড়িয়ে থাকব তোর সংসার তীর্থে। তুই আমাকে বিভক্ত কর। কোলে নে। দেখা দে।

দরিদ্র মা বাবা। তাদেরই বড় মেয়ে সারদা। মায়ের কাজে করে সাহায্য। ভাই বোনদের স্নান করিয়ে দেয়। খাওয়ায়। আবার বুকে জাপটে পাড়ায় ঘুম। ওরা দিদিকে খুব মানে। গম্ভীর প্রকৃতির সারদা। সাথী সঙ্গীরা ওকে সমঝে চলে। কম কথা বলে। কিন্তু যা বলে তা মমতায় মাখা সমতার কথা। ঝগড়া হলে মিটিয়ে দেয়। ভাব জমায়। ভালবাসে। যত্ন নেয়। করে খবরাখবর। এ যেন ওর জন্ম থেকে স্বভাব। হবে না কেন?

সারদা যে মমতাময়ী স্নেহ মূর্তি। সন্তানের দুঃখ দূর করতেই তো তার অবতরণ।

শিহড়ে গান হবে মায়ের বাবার বাড়ীতে। শ্যামাসুন্দরী এলেন সারদাকে সঙ্গে করে। অনেক লোক, জমাট আসর। কৃষ্ণলীলার গুণগানে অধিকারী তন্ময়। শ্রোতারাও মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছে গান।

মায়ের কোলে বসে ছোট্ট সারদাও শুনছে। আরো কত কত মেয়েরা বসেছে। একদিকে মেয়েরা। আর একদিকে ছেলেরা।

মায়ের এক সঙ্গিনী সারদার পানে তাকালেন। পরিহাসচ্ছলে বললেন,—হ্যাঁরে, বিয়ে করবি?'

স্পষ্ট উত্তর, 'করব'।

দুবছরের সারদার মুখে একি উক্তি? দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই।

দিব্যি সহজ সুন্দর। মাথা কাত করে শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গিনীর কথার জবাবে বললেন, 'করব'।

—কাকে বিয়ে করবে? কে তোমার কানু? সঙ্গিনীকে নির্দেশে দেখিয়ে দিলে—ঐ যে আমার বর।

অবাক বিস্ময়ে হতবাক সকলে—বলছে কি?

সকলের দৃষ্টি পড়ল ছেলেটির পানে। এ আবার কি গো! এ দেখি কত বড় ছেলে!

—তুমি ওকে বিয়ে করবে?

—হ্যাঁ—ঐ আমার বর।

অনেক বড় ছেলে। ছুবছরের মেয়ে সারদা তার মনের আসনে বরণ করল বিশ বছরের ছেলেকে।

কিন্তু ও কে? নাম কি? কার ছেলে?

বাড়ি কামারপুকুর। ক্ষুদিরাম চাটুজ্জের তৃতীয় ছেলে। নাম গদাধর।

তিন বছরের পরের ঘটনা।

মা চন্দ্রমনি ছেলেকে বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত। দিকে দিকে কনে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বয়স হয়েছে ছেলের। সংসারে একটু মতি নেই। সর্বদা অন্য দিকে মন দিনরাত এখানে ওখানে আপন মনে বিচরণ আর প্রাণমাতান গান গাইতে গাইতে আবার কাঁদে গদাধর। অঝোর কান্না। কাঁদতে কাঁদতে হারিয়ে যায় জ্ঞান।

গাঁয়ের লোকেরা তাই বললে চন্দ্রমণিকে—ওকে বিয়ে দাও, ঘরমুখো কর, ছেলের যা মতিগতি শেষে পাখী পালাবে।

চন্দ্রমনির বুকের মধ্যে শঙ্কার ঝড় জাগে। কণ্ঠ শুকিয়ে আসে। চিন্তার অবধি থাকে না।

কত খোঁজা খুঁজি তো হল। মনের মত মেয়ে আর জুটছে না। অবশেষে গদাধর নিজেই একদিন বললে, 'আমার জন্যে কোথায় মেয়ে

খুঁজে বেড়াচ্ছে? আমার বিয়ের পাত্রী জয়রামবাটীতে রাম মুখুজ্যের বাড়ীতে কুটো বাঁধা হয়ে আছে'।

প্রণতির আনন্দে নিবেদিত হয়ে কাল গুনছে। প্রতীক্ষায় অধীর শবরীর প্রতীক্ষা। যাও সেখানে। দেখ গিয়ে কনে।

পাগল ছেলের পাগলা কথা। তবুও মায়ের মনকে কেন যেন নাড়া দিল। গাঁয়ের চাষী তার বাগানের প্রথম ফলটিতে কুটো বেঁধে রাখে কেন?

ওটি মানুষের জন্য নয়—দেবতার।

তাই কুটো বেঁধে চিহ্নিত করে রাখে।

সারদামণি কুটো বাঁধা হয়ে আছেন। ও যে হবে দেবভোগ্যা। দেবতার লীলাসঙ্গিনী। হ্লাদিনী। শিব গৃহে শিবানী।

আমি এসেছি তোমার জন্য। তুমি এলে, তাই পিছু পিছু আমিও এলাম। তুমি তো বিশ্ব ভোলা। আমি না এলে কে করবে তোমার সেবা যত্ন? আত্মভোলা পুরুষ তুমি নির্বিকার ছাড়া আর কি।

পাঁচ বছরের মেয়ের পাশে বর হয়ে এল তেইশ বছরের ছেলে। গদাধর আর সারদা। শিব আর শক্তি।

কন্যাপণ পেলেন রাম মুখুজ্যে তিনশো টাকা। তখনকার দিনের প্রথা। তিন শো টাকার ব্যবস্থা করতে চন্দ্রমনিকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে।

কিসের জন্য এত কষ্ট?

যদি ছেলেটা ঘরমুখো হয়।

বিয়ে তো হল। কিন্তু গহনা কৈ?

বধূ বরণ করতে যে সোনার গহনা চাই।

বিমর্ষা চন্দ্রমনি। ভাবনার পাহাড় চাপল মাথায়। এখন উপায়? লোকে বলবে কি? ভেবে ভেবে আর কূল পাচ্ছেন না। অবশেষে মতলব একটা বের করে ফেললেন।

কি ?

লাহাদের বাড়ী থেকে ধার করে আনলেন গহনা।

পাঠিয়ে দিলেন।

তুমি কেন আসবে নিরাভরণা হয়ে ? আমার ঘরের লক্ষ্মী তুমি। লক্ষ্মীর তো অভাব ছিলনা ঐশ্বর্যের ? আমি কেমন করে তোমাকে বৈরাগিণীর বেশে ঘরে তুলব ?

অলঙ্কারে গা ঢেকে এসো।

বাবার কোলে চড়ে এলো নতুন বউ—

এলো কামারপুকুরে।

বৈশাখ মাস। রুদ্র রৌদ্রের খর তাপ। খাঁ খাঁ করছে চতুর্দিক। গাছে গাছে পেকেছে খেজুর। তলায় তলায় ছড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝেই বাবার কোল থেকে নেমে পড়ে সারদা। আঁচল ভরে কুড়োয় খেজুর।

'এই বুঝি নতুন বউ ?'—জিজ্ঞেস করে ধর্মদাস লাহা।

লজ্জায় লাল হয়ে যায় সারদা। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বাবাকে। লাফিয়ে ওঠে কোলে। মুখ লুকোবার যেন জায়গা পায় না। নতুন বউকে কোলে নিয়ে রাম মুখুজ্জে এসেছে জামাই বাড়ি। আনন্দের বান ডাকল। আনন্দের সাড়া পড়ে গেল চারিদিকে।

এত আনন্দের মধ্যে চন্দ্রমণি প্রাণখুলে হাসতে পাচ্ছেন না। বিষাদক্লিষ্ট মুখ। চোখে মুখে উৎকণ্ঠার অন্ধকার। একটু পরে কি হবে! কি করব আমি! কেমন করে খুলে আনব ঐ কাঞ্চন অঙ্গ থেকে সোনার অলঙ্কার ?

মায়ের পানে তাকিয়ে গদাধর বললে—এইজন্যে এত ভাবনা ? কিছু ভেবনা। আমিই খুলে দেব সব গহনা।

ঘুমের অঙ্কে শায়িতা সারদা। গদাধর একটা একটা করে সব গহনা খুলে নিল। লাহাদের জিনিস ফিরিয়ে দিল লাহাদের।

ঘুম ভাঙল সারদার। বিস্ময় মাখা দুটি চোখ। হাত দেখছে। গলা দেখছে। তাকাচ্ছে বারে বারে। অবশেষে স্বগতোক্তি—আমার গয়নাগুলো কোথায় গেল!

চন্দ্রমণির সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। মুখখানা ফেকাশে হয়ে গেল মুহূর্ত্তে। আর পারলেন না সামলে থাকতে। অধৈর্য্যা, চন্দ্রমণি বুকের মধ্যে জাপটে ধরলেন সারদাকে, 'ও গেছে যাক। গদাই তোমাকে আরো ভালো ভালো গয়না দেবে।'

সে অলঙ্কারের রূপ অপরূপ। প্রাণের স্পর্শে তা দীপ্তিময়। খাদহীন খাটি সোনার গহনা পরাবে গদাধর তোমাকে।

পরবর্ত্তী দিনে বললেন একদিন ঠাকুর, বললেন তাঁর ভাগনে হৃদয়কে, 'ওরে হৃদে, ছাখ্ তো, তোর সিন্দুকে কত টাকা আছে!'

হৃদু বললে, 'তিনশো।'

ঠাকুর বললেন, 'ওকে ভালো করে দু'ছড়া তাবিজ গড়িয়ে দে। আর ডায়মন কাটা বালা দে একজোড়া। ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী। তাই সাজতে ভালোবাসে।'

সারদার কান্না থামে না। চোখের জল শুকোয় না। পাঁচ বছরের সারদা মাঝে মাঝেই ডুকরে ওঠে,—আমার গায়ের গয়না খুলে নিলে কে!

একটা রহস্য। সত্যি কিছুই বুঝে উঠতে পারছেনা ছোট্ট মেয়েটি।

সারদার কাকা জোগায় তাতে ইন্ধন—এ আবার কেমন ধারা গো? দিয়ে আবার খুলে নেওয়া হ'ল।

রেগে আগুন কাকা। বললেন—চল আর এখানে থেকে কাজ নেই। এ কি জাতীয় কারচুপি হে। এ কি মানুষের কাজ।

সারদাকে নিয়ে চলে এলেন জয়রামবাটিতে।

চন্দ্রমণির মাথা কাটা গেল লজ্জায়। দুঃখে পাঁজর ভেঙ্গে যাবার

উপক্রম। নিদ্রা নেই নয়নে। রুচি নেই আহারে। উন্মনা চন্দ্রমণি। একাকী ফেলেন দীর্ঘশ্বাস। অদৃষ্টকে দেন ধিক্কার। কি করে তিনি মুখ দেখাবেন। লোকে বলবে কি। ছিঃ ছিঃ, এর চেয়ে বুঝি মরণেও শান্তি ছিল।

গদাধর অটল। তার একটুও ভাবের অভাব নেই। যেমনি ঠিক তাই। মায়ের কথা শুনে হাসে। জলের মত দেয় সমাধান। —এ জন্যে তুমি এত বিচলিত? গেছে যাক না। কি হয়েছে? বাঁধন কি আর শিথিল হয় মা?

এ যে যুগ যুগান্তের বন্ধন। কে তা ছাড়ে, কে তা ভাঙ্গে। এই শক্তিই গোলকে এসেছিলেন রাধারূপে। লক্ষ্মী নামে এলেন বৈকুণ্ঠে। ব্রহ্মলোকে বলল তাঁকে সাবিত্রী। কৈলাসে তো ইনিই পার্বতী। আবার সীতা রূপে এলেন মিথিলায়। রুক্মিনী এলেন দ্বারকায়। এবারে যে সেই শক্তিই এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে সারদা নামে।

তাইতো গদাধর অটল। অনড়। এতসব কাণ্ডের পরেও অখণ্ড। অভঙ্গ।

চার

শ্বশুরালয়ে এসেছে গদাধর।

দ্বিধা নেই। দ্বন্দ্ব নেই। নেই কোনো সঙ্কোচের বালাই
একেবারে শুচিশুদ্ধ একটি মানুষ। লোকোভয়, আর লোকোনিন্দ
থোরাই পরোয়া করে সে।

পরপর দুটো বছর চলে গেছে। সারদা এখন সাত বছরের বধূ

কি হবে তাতে?

ঐ ছোট্ট শিশুটির মধ্যেই বয়োঃবৃদ্ধার উপকরণ। ঘটি ভ
জল নিয়ে এল। ধুয়ে দিল গদাধরের চরণযুগল। মুছিয়ে দি
মাথার চুল দিয়ে। কত ভক্তি। কত বিনম্রতা। বসল ঘন হয়ে
হাওয়া করতে লাগল পাখা দিয়ে।

এ যেন শিবের চরণ-তীর্থে শক্তির আত্মনিবেদন।

বড় প্রীত হল গদাধর। খুশীতে ভরে গেল তার মন। ক
ছোট্ট সারদা, অথচ কত বড় জ্ঞান। হবে না কেন? ও কি যে সে
এই ছোট্ট চারাগাছটির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে অরণ্যের সঙ্গীত
শ্বেতশুভ্র শঙ্খটির মধ্যেই না লুকিয়ে থাকে কল্লোলিত সমুদ্রে
প্রলয় গর্জন।

সারদার আবির্ভাব কেন হয়েছে?

লোক শিক্ষা আর লোক দীক্ষাই যে তার কাজ। তাই
ছোট হলেও বড়র বোধে সে উদ্বোধিত।

লোকেরা বলে পাগল জামাই। বলবেন না কেন? গদা
যে খুশীর সম্রাট। ভাবের পাগল খেয়ালের নভে মেলে দেয় ডান

ড়ে চলে যেমন খুশী তেমন। কি যে বলে আর কি যে করে া সে নিজেই জানে না। সব সময় আনন্দ। আনন্দ সাগরে যেন ন্তরণ করে চলেছে গদাধর। মুখে শুধু হাসি আর হাসি।

বসে ছিল গদাধর। সহসা চেঁচিয়ে উঠল, 'এবার আমি কাউকে াড়ছি না, যম হোক, চণ্ডাল হোক, যে-ই হোক না কেন—।

সচকিত হল সকলে। মিলিয়ে নিল কথাগুলো —'দেখ, দেখ, াগল আর কাকে বলে।'

লোকের কথায় কান দেয় না সারদা। স্বামীর প্রতি তার বিন্দু বরক্তি বা অশ্রদ্ধা নেই। বড় আপন বলে মনে হয়। চোখ ফরাতে ইচ্ছে করে না। বড় ভাল লাগে। লাগবে না কেন? াকে দর্শনে তৃপ্তি, পরশনে শিহরণ, তার মত আপন জন কে আছে আর?

ছোট্ট বধূ। কিন্তু বড়দের মতো করে সব কাজ। কত উৎসাহ। ত আনন্দ। ওর কোনো দুঃখ নেই। কোনো কান্না নেই। ারদার মন কানায় কানায় ভরা। সে যে পূর্ণ কুম্ভ।

জোড়ে ফিরল জয়রামবাটি থেকে কামারপুকুরে দুজনে।

গদাধর বলল একদিন সারদামণিকে, 'যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বে তোমার বিয়ে হয়েছিল, সাত বছর বয়সে বোলো না যেন, বলবে পাঁচ বছর বয়সে। ছেলে মানুষ বছর গুলিয়ে ফেলো না যেন—,

কোত্থেকে ভাগনে হৃদয় এসে বললে—'মাগো তোমাকে পুজো করব। তোমার কোন্ ফুল পছন্দ?'

বাধা দিয়ে বলেন মা, 'না না, আমাকে পুজো কেন? ঠাকুরের পুজো করো। ঠাকুর সাদা ফুল ভালবাসে।'

ম্লান হল ভক্ত। ব্যথা পেল অন্তরে। বড় সাধ ছিল ও চরণে কুসুমার্ঘ দিতে।

করুণাময়ীর মন গলে গেল বেদনাহত সন্তানের পানে তাকিয়ে। মমতাময়ীর মনে হল মমতার উদ্রেক ; 'আচ্ছা কিছু হলুদ ফুল এনো।

মরা নদীতে যেন বান ডাকল।

ভক্ত ছুটল ফুল আনতে। বললেন মা—এসো ঐ শ্বেত শুভ্র পুষ্পে ঠাকুরের চরণ সাজাও। আমাকে দাও হলুদ ফুল।

শিবের বেলায় শুভ্র পুষ্প। তুমি কেন পীত পুষ্পে প্রীত হও? তবে কি তুমি মা বগলা?

আধর দেন সারদামণি, 'কি যে বলো, ঠিক নেই।'

এখানেই চাপা পড়ে গেল। আর এগোতে দিলেন না মা। এ কি মুখে বলে বোঝান যায়। বুঝতে হয় অনুভূতি দিয়ে। দেখতে হয় মানস নয়নে। অন্ধকার ঘরে বস। জ্বেলে দাও মাটির প্রদীপ। নয়ন মুদে বসে থাকো। অন্তর দিয়ে ডাকো মাকে। আঁখিজলে ভাসিয়ে দাও বক্ষ। ডাকার মত ডাকো। কেঁদে কেঁদে ডাকো। সন্তান কাঁদলে মা কি না এসে পারেন।

ক্রমে তেলের প্রদীপটি যাবে নিভে। মায়ের তনুভা বিচ্ছুরিত হয়ে পড়বে। জ্যোতির জোয়ারে ডাকবে বান। তুমি তার মধ্যে ডুবে যাবে। ক্রমে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তোমার আকাঙ্ক্ষিত মাতৃ-মূর্তি বা চরণযুগল।

এবারে দেখ। প্রাণভরে দেখ। দেখ তোমার দিব্য নয়ন মেলে এ মা কোন মা? কে এই সারদামণি?

ছোট্ট বালিকা বধূ নয় আর সারদা। বড় হয়েছেন। পদার্পণ করেছেন চৌদ্দের কোঠায়। এ বড় দুঃসহ বয়স। চলে এলেন সারদামণি কামারপুকুরে।

গদাধর দক্ষিণেশ্বরে। ব্যাকুল ভক্ত দিনরাত মাতৃ নামে বিভোর। মাকে দেখবার জন্য আকুল। কান্না আর কান্না। কেঁদে কেঁদে বলছেন তিনি—দেখা দে, দেখা দে মা। আর পারিনে সইতে

তোর অদর্শনের জ্বালা। দিনের পর দিন যায়, কৈ তোর তো দেখা মিলছেনা। তুই 'কি আর আসবিনে? দিবিনে আমাকে দেখা? দেখা দে! দেখা দে!

চোখে নামে অশ্রুর বর্ষণ। মা-মা বলে হারিয়ে ফেলেন জ্ঞান। মায়ের নামে ডুবে যায় অথৈ ভাব সমুদ্রে।

ওদিকে সারদার চোখেও জল। তার অন্তরেও ঐ একই অরুন্তুদ আর্তি—কবে তোমার দেখা পাব। আর যে না দেখে থাকতে পারছি নে। একবারটি দেখা দাও আমাকে।

স্নান করতে যাবেন সারদামণি হালদারদের পুকুরে। কিন্তু কার সঙ্গে যাবেন? একাকী যেতে বড় লজ্‌জা করছিল। কোথা থেকে যেন এসে দাঁড়াল আটটি মেয়ে। বললে—স্নান করতে যাবে বুঝি? চলো, আমরা তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার সামনে পেছনে থাকব আমরা। তুমি থাকবে মাঝখানে। কেউ দেখতে পাবেনা তোমায়।

চলো।

ওদের সঙ্গে স্নান করতে গেলেন সারদা। চলতে চলতে এক সময়ে জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কে গা?

অষ্ট কণ্ঠে এক উক্তি—তোমার সাথী, তোমার বন্ধু। এই পাড়ারই মেয়ে আমরা।

রোজ স্নানে নিয়ে যায়। রোজ আবার দিয়ে যায় পৌঁছে। মায়ের জনৈক ভক্তের চোখ পড়ল। একদিন বলেই বসল সে, 'ওরা বুঝি তোমার অষ্ট সখী মাগো?

মা এড়িয়ে গিয়ে বলেন, 'কে জানে বাপু, তোমার কেবল ঐ এক কথা।'

তুমি যতই লুকোতে চাও, ততই ব্যক্ত হয়ে পড়। ব্যপ্ত হয়ে পড়। আকাশে সূর্য উঠলে মেঘ তাকে ঢেকে রাখবে কতক্ষণ?

পঞ্চবটীতে ধ্যানে বসেছেন লাটু মহারাজ। বড় জমাট ধ্যান লাটু তন্ময়। রাত্রির এ নির্জন নিশীথে লাটু নিজেকে রিক্ত করে দিয়ে সিক্ত হচ্ছে অশ্রু অর্চনায়। ঠাকুর যাচ্ছে কোন পথ দিয়ে। হঠাৎ হাঁক ছাড়লেন, 'ওরে লেটো, কার ধ্যান করছিস ?'

লাটু উৎকর্ণ হল। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল আবার ঠাকুরের মধু-কণ্ঠ, 'যা, ঐ নবত ঘরে। সেখানে সাক্ষাৎ ভগবতী আছেন। রুটি বেলছেন বসে বসে। তার রুটি বেলে দে যা।'

গুরু বাক্যই সিদ্ধ মন্ত্র। লাটু ছুটে চলল। হাজির হল গিয়ে নবত ঘরে। মায়ের সেবায় নিযুক্ত করল নিজেকে। এই প্রত্যক্ষ সেবার তুল্য বড় পূজা আর কি আছে ?

লাটু মা সম্বন্ধে বলে, 'ঠাকুর পূজো গ্রহণ করেছেন— বুঝো ব্যাপার। মা-ঠাউন যে কি তা শুধু তিনিই বুঝেছিলেন। তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী। তার দয়া বুঝতে গেলে বৃহৎ তপস্যা দরকার।'

এই লাটুরই আবার ঘটল একদিন বিভ্রান্তি।

মা এসছিলেন বলরাম বোসের গাড়িতে। সেখান থেকে ফিরে যাচ্ছেন জয়রামবাটীতে। ভক্ত শিষ্যরা প্রণাম করতে লাগলেন মাকে। কিন্তু লাটু আসছেন না। তার অন্যভাব। সে জ্ঞানের গর্বে গর্বিত হয়ে একটা ঘরের মধ্যে আপন মনে পায়চারি করছে। মনে মনে বলছে লাটু, সন্ন্যাসীকো কো পিতা, কো মাতা। সন্ন্যাসী নির্মায়া।'

মায়ের কানে কথাটি প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে মা বললেন, 'বাবা লাটু, তোমার আমাকে মেনে কাজ নেই।'

লাটুর সম্বিৎ ফিরল মায়ের স্নেহের শাসনে। দুচোখ ঠেলে অঝোরে কান্না এল। লুটিয়ে পড়ল গিয়ে মায়ের চরণ প্রান্তে—মা, মাগো, তোমার কোল ছাড়া পৃথিবীতে এতটুকু ঠাঁই নেই। এমন কোনো সীমা নেই, যা তোমার দৃষ্টির বাইরে। আমি যে তোমার কোলের প্রত্যাশায়ই গৃহহারা। মাগো, আমাকে তুমি বঞ্চিত করো না।

দিও না আমাকে তুমি প্রত্যাখ্যানের বেদনা। তোমার অভয় অঙ্ক না পেলে আমি যে আর বাঁচব না।

করুণাময়ীর চোখ ফেটে কান্না এল। তাঁর অন্তর স্পর্শ করল ভক্তের বেদনাগ্নির উত্তাপ। সন্তানের কান্নায় মায়ের চোখেও এল বেদনার অশ্রু। মায়ের কান্না থামে না। লাটু মাকে কান্না ধোয়া কণ্ঠে বলতে থাকে, 'বাপ ঘরে যাচ্ছো মা? কাঁদতে নেই। শরোট আবার শিগগির তোমাকে নিয়ে আসচে। কেঁদো না মা, যাবার সময় ফেলতে নেই চোখের জল।'

ঠাকুরের ভাই-ঝি লক্ষ্মী নিয়ে এসেছে একখানা বর্ণ পরিচয়। লেখা পড়া শিখতে লক্ষ্মীর বড় সাধ। একদিন মা আর লক্ষ্মী দুজনে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ছিল বর্ণপরিচয়।

হঠাৎ করে হৃদু দেখতে পেল। অমনি বলে উঠল সে, 'মেয়ে ছেলের লেখা পড়া শিখতে নেই। শেষে নাটক নভেল পড়বে।'

বউ সারদা। আর ধরলেন না বর্ণপরিচয়। কিন্তু লক্ষ্মী পড়া ছাড়তে পারল না। সে ভর্তি হল গিয়ে পাঠশালায়। সেখান থেকে লক্ষ্মী যা শিখে আসে, গোপনে গোপনে তা আবার এসে শিখিয়ে যায় সারদামণিকে।

মনে মনে মা ভাবেন, এতে ঠাকুরের সম্মতি আছে কি? মনের প্রশ্নের জবাব দিলেন একদিন মনের মানুষটি। বলছিলেন দক্ষিণেশ্বরে বসে পীতাম্বর ভাণ্ডারীর ছেলেকে—লক্ষ্মণ তোর খুড়িকে পড়িয়ে দিস প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগটা। সারদা কথাটি শুনতে পেলেন। পেলেন তাঁর নীরব প্রশ্নের জবাবটি।

শ্যামপুকুরে ঠাকুর অসুস্থ। সারদামণি আছেন কাছেই। ভব-

মুখুজ্জের একটি মেয়ে রোজ আসে মাকে দেখতে। বড় ভালবাসে মাকে। এলে আর যেতে চায়না তার মন। রোজ গঙ্গা স্নান করে এই পথে একবার আসা চাই-ই এসে পড়া দেয় মাকে। আবার পড়া নেয়ও আদায় করে। এমনি করে করে রামায়ণ মহাভারতও পড়া হয়ে গেল জননী সারদার।

মেয়েটির গুরুগিরীর বিনিময়ে মা দেন তাকে শাক পাতা খেতে।

এই আমার গুরু দক্ষিণা। আর কি দেব। আর কি দিতে পারি। দিতে পারি আমার ভালবাসা। আমাব প্রীতি। আমার শুভেচ্ছা।

মা বলতেন, 'ঠাকুর লেখা পড়া কিছু জানতেন না। নাই জানুন, তবু এবার তিনি এসেছেন ধনী-নির্ধন পণ্ডিত মুর্খ সবাইকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া বইছে চারিদিকে, যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে। যার মধ্যে যতটুকু সার আছে, বাঁশ আর ঘাস ছাড়া সব চন্দন হয়ে যাবে। তোমাদের ভাবনা কি, তোমরা তো আমার আপন লোক—তবে কি জানো? বিদ্বান সাধু যেন, হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধান।

মানে হাতির দাঁতে সোনার বন্ধনী। অর্থাৎ, ভক্তিতে ভালবাসার লাবণ্য মাখানো। মনে দানা বাঁধলেই হলো। ভালবাসার রং ধরবে। জ্ঞানের উন্মেষ হবে। এ আপনি জন্মে। তর্কে, শাস্ত্রে এ জ্ঞান ধরে না। পুথির পাতায় পাওয়া যায়।

আদিকে ধরতে হয়। তবেই অনাদির সন্ধি মেলে। ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলতে হয়। লতার মত জড়িয়ে ধরতে হয়।

ঠাকুর বলে, 'নরেন আমাকে যত মুখ্‌খু বলে, আমি তত মুখ্‌খু নই। আমি অক্ষর জানি।'

ঐ জানাটিই সর্বশেষ জানা। সর্ব বিদ্যার সার বিদ্যা হল অক্ষরের

সঙ্গে অন্তরের পরিচয় ঘটান। ঠাকুর অক্ষরের মধ্যে আবার আদি অক্ষরটিকেই ধরে বসেছেন শক্ত করে। সেই ক আর ক। মানে, কৃষ্ণ আর কালী। কালী আর কৃষ্ণ।

ক জানলেই সর্ব বিদ্যায় পারঙ্গম হওয়া যায়। সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করা চলে। ক দিয়ে কান্না সুরু করে ব্রহ্মময়ী কালীর পদতীর্থ পর্যন্ত গতাগতি করবার পথটি প্রশস্ত করে নেওয়া যায়। ঠাকুর যে ঐ ক অক্ষরের মধু পানেই দিন রাত তন্ময়।

॥ পাঁচ ॥

সারদার জন্য পাড়াপড়শীদের চোখে ঘুম নেই। ওঁর কথা নিয়েই যেন সবাই ব্যস্ত। দুঃখে প্রাণ ফেটে যায়। দেখা হলে করুণার চোখে তাকায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে, 'কি কপাল! কি কপাল! একটা পাগলার সঙ্গে বিয়ে হল শ্যামার মেয়েটার!'

সকলের এ মমতা সারদাকে তীব্রভাবে আঘাত করে। এ অনুকম্পা তাঁর অসহ্য। যন্ত্রণায় মনটা বিষিয়ে ওঠে। আর দাঁড়াতে পারেন না সেখানে। ত্রস্ত পদপাতে চলে আসেন সে কু-সঙ্গ বর্জন করে।

পাগল নিয়ে ভুগি তো আমি ভুগব। বলি তোমাদের এ মায়া-কান্না কেন?

রামপ্রসাদ বলেছিলেন—'আমায় দে মা পাগল করে।' ভক্ত সাধকের অন্তর নিংড়ানো আর্তি। পাগল না হলে যে পরম প্রাপ্তি ঘটে না। জাগতিক জ্ঞানের বাইরে তাঁর চরণ ছন্দ নিয়ত বাজছে।

সে ধ্বনি শ্রবণ করতে হলে এ জ্ঞান থেকে যেতে হবে মহাজ্ঞানে। মহাজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত লোক দেখলে জাগতিক রাজ্যের অজ্ঞান লোকেরা পাগল বলবে বৈ কি ?

পাগল কি যে সে হতে পারে রে ? আত্মভোলা পুরুষ বৈ পাগল হতে পারে কে ? আত্মভোলা মানে 'আমিটির' মরণ হওয়া। আমি মরে গেলে কি থাকে—তুমি। তুমিময় জগতে সবই তাঁর লীলা। যতক্ষণ আমির দাপট থাকে, ততক্ষণ তুমিটি আসে না। যেই আমি গেল, অমনি তুমি এলো। মানে তৎপুরুষ তৎপর হল।

রামকৃষ্ণ যে নিরুপাধিক। আমি হীন। তাই তো সে পাগল। তাইতো আনন্দছন্দে নৃত্যরত। হাসি আর আনন্দে মাতোয়ারা মানুষটি। সর্বদা বলেন ঈশ্বরীয় কথা। দিব্য ভাবে বিভোর। দিব্য জ্ঞানে অধিষ্ঠিত। দিব্য কথায় মুখর।

দেখতে দেখতে অতিক্রান্ত হয়ে গেল সাতটা বছর। জন্মভূমি দর্শনের জন্য ঠাকুরের মন করে আকুপাঁকু। তাছাড়া নানা পথের, নানা জাতের ধ্যান সিদ্ধ হয়ে ঠাকুর এখন অন্য মানুষ। কত এলো। কত গেল। এলো ফকীর। ভৈরবী ও বৈদান্তিক। তারা যে যার পথের সন্ধান জানিয়ে গেল ঠাকুর রামকৃষ্ণকে। নানা কঠোরতার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে দেহটিও এখন ক্লান্ত। তাই একবার বাড়ির কথা মনে পড়ল।

দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুরে এলেন রামকৃষ্ণ। সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁর তন্ত্র সাধনার গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে।

সংবাদটি ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। দলে দলে লোক এল। এল সাথী সঙ্গিরা। সকলের সঙ্গে তাঁর সমান মেলা মেশা। ধনী দীনে কোনো ভেদ নেই। ও চরণ, ও বক্ষ সকলের জন্য উন্মুক্ত। সোনার মানুষটি যেন। ননীতে গড়া দেহ। আহা কি ভাব! সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে। দেখে তাদের সেই পাগল

গদাধরকে। মনে মনে প্রণাম জানায়। ভক্তিতে মাথা আপনি আসে নত হয়ে।

পাগল? কে পাগল? এ যে দিব্য পুরুষের দিব্য ভাব। সমতার মমতায় প্রাণময়। অপরূপ। অনিন্দ্য। সব ভোলান ভোলানাথ।

জয়রামবাটিতে খবর পাঠান হল—আমি এসেছি। তুমি চলে এসো!

জয়রামবাটি থেকে সারদামণি চলে এলেন কামারপুকুরে। এসে তো অবাক। এ যে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। কত ভয় ছিল সারদার মনে—না জানি কি গিয়ে দেখবে। লোকে তো বলতে কিছু বাকি রাখেনি।

কিন্তু সারদার সব ধারণা উল্‌টে গেল। যত দেখে তত মেতে ওঠেন। এ মধু ফুরোয় না। এ নেশা জুড়োয় না। সারদার আনন্দের সীমা নেই। আনন্দের পূর্ণ হাটে আনন্দময়ী এসেছেন। প্রাণ সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করছেন মমতার মগ্নতায়।

সহধর্মিনীর সব ভার গ্রহণ করলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

এক এক ক'রে সব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন—প্রদীপের সলতে পাকাতে হয় কেমন করে জানো? শুনে নাও।

কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে, তাও বলে দিচ্ছি।

ভগবানকে ডাকতে হয়। ধ্যান-ধারণার দ্বারা চিত্তকে ঈশ্বরমুখী করতে হয়। তাঁর কাছে এগিয়ে যেতে হয়।

—কেমন করে?

—মন দিয়ে শোন। সব বলে দিচ্ছি তোমাকে।

রামকৃষ্ণের অমৃত কণ্ঠ শুনে যাচ্ছেন সারদা নিবিষ্ট মনে। এ যেন গুরুর সান্নিধ্যে শিষ্যার পাঠ গ্রহন। মাষ্টারের কাছে ছাত্রীর বিদ্যাধ্যয়ন।

বললেন একদিন ঠাকুর, 'চাঁদ মামা সকলের মামা, তেমনি ঈশ্বরও সকলের অতি আপনার, যে তাঁকে মনে-প্রাণে ভালবাসে, ডাকে, সে তাঁকে দেখতে পায়। তুমি যদি ডাক, তুমিও তাঁর দেখা পাবে, আর তাঁর দেখা পাওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য—নতুবা জীবন বৃথা।'

মানুষ হয়ে জন্মেছ। ঈশ্বরকে ডাকবে না? এমন সার্থক জনম সার্থক করে তুলতে হবে ভগবানকে লাভ করে।

সংসারে কাজ অনেক। দুঃখ অনেক। আনন্দও অনেক। কিন্তু সব কিছুর উপরে নেই কি একটি আবেশমগ্ন মুহূর্ত?

আছে।

সে মুহূর্তটি কেন? কিসের জন্য?

ঈশ্বর সঙ্গ করবার জন্য।

তাঁর লীলা সঙ্গিনী হবার জন্য। পাথ পদ্মে নানা উপাচারে অর্চনা দিয়ে তাঁকে প্রীত কর। রসে রঙ্গে তাঁর সঙ্গে মেতে থাকো। তবেই না মানব জীবন সার্থক হবে?

তুমিও তাঁকে ডাকবে। তিনি তোমার সব বাসনা পূর্ণ করবেন।

অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকেন সারদামণি। শ্রবণ করেন ঠাকুরের মধু মুগ্ধ কণ্ঠ। এ তো উপদেশ নয়, যেন মন্ত্র দীক্ষা।

রাত ভোরে ঘুম ভাঙ্গে ঠাকুরের। বাইরে নামেন ঘর থেকে। মুক্ত প্রাঙ্গণে মুক্ত বিহঙ্গের মত করেন বিচরণ। একসময়ে গলাছেড়ে হাঁক ছাড়েন মাকে উদ্দেশ্য করে, 'ওগো, এই-এই সব রান্না করো আজ।'

পরম যত্ন ভরে ব্যগ্র বাসনা নিয়ে রান্না করতে গেলেন শ্রীমা। বলেন পাঁচফোরণ তো নেই। ডালে কি দেব গা?

ঠাকুরের ভাইজী লক্ষ্মী। তার মা বললেন—যা আছে তাই দিয়ে রান্না কর গে।

কথাটা শুনতে পেলেন ঠাকুর। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন 'এক পয়সার আনিয়ে নেও না। যাতে যা লাগে তা না হলে কি চলে ?'

এমন কথা শ্রীমাও বলতেন, 'যখন যেমন, তখন তেমন।'

মেমসাব এসেছে। প্রণাম করল মাকে। মা বাড়িয়ে দিলেন হাত। যেন করমর্দন করলেন।

বেশ কাটছে দিন। আনন্দে, হর্ষে, পুলকে, প্রাণে। সারদা বলেন, 'হৃদয়ে কে যেন একটি আনন্দের ঘট স্থাপন করে রেখেছে।'

ভৈরবী যোগেশ্বরী সাজালেন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে। মনের মত করে সাজালেন। ফুলের মালা পরালেন কণ্ঠে। ভালে একে দিলেন চন্দনের তিলক। আরো কত কি।

ঠাকুর কিন্তু ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। বসে আছেন স্থাণুর মতন। বাহ্য জ্ঞান একেবারে শূন্য।

ভৈরবী ছুটে গেলেন সারদামণির কাছে—দেখবে এসো!

এস্ত পদসঞ্চার। ওমা, এ কেমন বেশ! আমি যে তাকাতে পারিনে।

ভৈরবী শুধালেন, 'কি গো কেমন লাগছে ?'

ক্ষীন কণ্ঠে জবাব দেন সারদা, 'বেশ হয়েছে।'

বেশ হয়েছে তো বটে। কিন্তু এ সন্ন্যাসীর বেশ। বৈরাগ্যের প্রাক্ সজ্জা। না-না তুমি অমন করে ওঁকে সাজিও না। দিও না গৌর অঙ্গে ফুলমালা। চন্দনের প্রলেপ। না-না আর তুমি সেজনা। তুমি আমার হয়ে থাকবে আমার ঘরে। আমি করব তোমার সেবা। তোমার পূজা। সেই তো আমার সব সাধনার সেরা সাধনা। এমন খেলায় দুজনে মেতে থাকব আমরা। এই পান্থশালার খেলা শেষে আমি ঘুমিয়ে পড়ব তোমার চরণ মৃণালে। ও গো, সে যে আমার কত বাঞ্ছিত, প্রার্থীত স্বর্গ, তা কি তুমি বোঝনা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ কাছে ডাকলেন সারদা মণিকে। মনের মানুষ ডাকে সাড়া দিলেন। পরম স্নেহভরে মধুর কণ্ঠে বোঝাতে লাগলেন। জন্ম দিলেন—ভগবানে মতি, রতি।

শ্রীমতি বলে কাকে জান?

ঈশ্বরে যার মতি অটুট, সেই শ্রীমতি। শ্রীটুকু ঈশ্বরের। আর মতিটুকু তোমার। দুই মিলেই শ্রীমতি।

মতি থাকলেই রতি জন্মে। রতি এলেই মন রজশলা হল। ঈশ্বর তখন তোমার মন কুসুমে ভ্রমরার মত বসে থাকবেন। তুমি ভাসবে তখন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে। ওখানে কোন আচার অনাচার নেই। পবিত্র অপবিত্র নেই। সব শুদ্ধ মুক্ত স্নিগ্ধ শান্ত। সংস্কারের অন্ধকার ওখানে আলোর আপ্লবে অস্থির। একেবারে পালাতে পথ পায় না।

সে বারে রাত্রে আসেনি রাঁধুনি। মহা বিপদ কে রান্না করে?

বারুইদের মেয়ে সুশীলা এসে বললে, 'আমি রাঁধলে তুমি খাবে মা?'

মা বললেন, 'তোমরা আমার মেয়ে, তোমাদেয় রান্না খাব না তো কার রান্না খাব?'

সুশীলার আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু কেদারের মা সৃষ্টি করলেন অনর্থের, 'তুমি বামুনের মেয়ে হয়ে এদের রান্না কেন খাবে?...তুমি তো আর ঠাকুরের মত সন্ন্যাসিনী হওনি।'

মায়ের মুখ গেল ম্লান হয়ে। সুশীলার পানে তাকিয়ে বললেন মা 'এদের জ্বালায় কিছু হবে না। শুনলে তো এই রকম সব বলে। তা তুমি মনে কিছু কষ্ট পেয়ো না। ঠাকুর যদি সুযোগ দেন তো হবে।'

নৈকট্যের অস্তিক সম্বন্ধ সব বন্ধনকে দেয় ছিন্ন করে। কেবল কাছে টানে। চিরাচরিত ছন্দের পতন ঘটে। লোকালয়ে হয়তো সে বেহিসেবি, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে তার তুল্য কজন মেলে?

সুশীলা দুঃখ পায় নি। পেয়েছে মায়ের প্রাণঢালা স্নেহ আর

মমতা। ঐ তো তার পরম সম্পদ। সুশীলার রান্না খেতে সম্মত হওয়া মানেই গ্রহণ করা। উৎসর্গ আর গ্রহণ তো পূর্বেই হয়ে গেছে। লোকাচার আর সংস্কার কি পারে মনকে বেঁধে রাখতে ?

ভক্ত ছেলেরা খেতে বসেছে। খাওয়া শেষে এটো কুড়োতে যাচ্ছে তারা। মা এসে দাঁড়ালেন—'থাক, লোক আছে।'

কিন্তু কে সে লোকটি ?

মা নিজেই।

সাথীরা বললে, 'তুমি বামুনের মেয়ে, এদের গুরু। এরা তোমাব শিষ্য, তুমি এদের এঁটো নাও কেন ? এতে যে ওদের অমঙ্গল হবে।'

মা বললেন,—ও কি কথা ? মা ছেলেরটা করলে কখনো কি তাতে অমঙ্গল হয় ? বরং মায়ের আশীর্বাদ বর্ষণে ছেলেদের মঙ্গলই হবে। অমন অলক্ষুণে কথা আর ব'ল না।

পরম আনন্দ ও তৃপ্তির সুধা সায়রে অতিক্রান্ত হল সাতটি মাস। নিজহাতে সেবা যত্ন করলেন সারদা শ্রীরামকৃষ্ণের। এবারে ছাড়াছাড়ির পালা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ফিরে গেলেন মর্ততীর্থ দক্ষিণেশ্বরে। মা চলে এলেন জয়রামবাটিতে।

প্রত্যক্ষ আনন্দের মেলাটি ভাঙ্গল। বিরহের বেদনা অন্তরকে দহন দানে যেন আরো কাছে টেনে নিতে চাইল। মায়ের চোখে ঘুম নেই। প্রতীক্ষায় সে আঁখি অপলক।

॥ ছয় ॥

হৃদয় বিদারণ সংবাদ—উন্মাদ! একেবারেই উন্মাদ হয়ে গেছে। জ্ঞান-গম্যি বলতে নেই কিছু। কেবল গঙ্গা আর মন্দির। অবিরাম ছোটা-ছুটি। একাকী কথা বলে। জঙ্গলে রাত কাটায়। মুহূর্তের জন্যও ঘরে মন টেকে না।

মা-মা ধ্বনিতে আকাশ দীর্ণ হয়ে যায়। দক্ষিণেশ্বরের বন-কুঞ্জে জাগে মর্মর। কেবল কান্না আর কান্না। মাটিতে মুখ ঘসে ঘসে রক্তাক্ত করে ফেলে। পরণে কাপড় নেই। মাথার চুল এলোমেলো। বিরামহীন আর্তি। বিরামহীন কান্না—দেখা দে! দেখা দে মা। দেখা দে!

একটার পর একটা সংবাদ—কাঁধে একটা লাঠি। মন্দিরের চতুর্দিকে বারে বারে করে প্রদক্ষিণ। কারো কথায় কান দেয় না। ও যেন খুশীর সম্রাট।

সব কথা শুনে উতলা হয়ে উঠল সারদামণির মন। নীরব অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল চোখের কোণ বেয়ে টপ টপ করে। সেই মানুষটি এই হয়ে গেল! মাত্র কয়েকটা দিনে এত বড় পরিবর্তন? এ কি সম্ভব। অমন স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা সব নিঃশেষ হয়ে গেল! তিনি পাগল হতে পারেন?

নানা প্রশ্নের প্রভঞ্জন অন্তরকে মন্থন করে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস হয়ে আকাশে মিলিয়ে যায়। বুকের পাঁজরগুলো যেন ভেঙ্গে দুমড়ে চৌচির হয়ে যেতে চায়। হাহাকার হতাশায় বিদিশার অন্ধকারে হারিয়ে ফেললেন সবই। নানা প্রশ্নের শরবর্ষণ হয় অন্তরে—

যদি কাছে যাই, যদি গিয়ে দাঁড়াই মুখোমুখি, তবে কি, তবে কি তিনি চিনতে পারবেন না আমাকে? তাকাবেন না ফিরে আমার পানে? তাঁর সেই মমতামধুর প্রসন্ন শাশ্বত দর্শন আমি কি আর ফিরে পাব না?

ওগো, আমি বসে আছি তোমার পথ চেয়ে—আলো জ্বেলে। তুমি একবারটি ডাকো। আমি পা বাড়িয়ে আছি।

শক্তির মন আজ চঞ্চল। ডাক না এসে পারে? ডাক এলো। মনের মানুষ মনকে করলেন আকর্ষণ।

দোল পূর্ণিমা আগত। গাঁয়ের একদল মানুষ যাচ্ছে কলকাতায় গঙ্গাস্নানে। সারদা মনে করলেন তাদের সঙ্গে যাবেন। দেখে আসবেন গিয়ে নিজের চোখে।

বাবাকে কি কথাটা বলব?

লজ্জায় লাল হয়ে যায় সারদার মুখ। সরমে কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যেতে চায়। কি করে নিজে তিনি বলবেন! মহাচিন্তায় পড়লেন। চিন্তামণি চিন্তা দূর করে দিলেন। এক আত্মীয় কথা তুলল রাম মুখুজ্জের কানে। রাজী হলেন তিনি। পথঘাটের কথা চিন্তা করে বললেন —আমিই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

যেতে হবে হাঁটা পথে। আর কোনো ব্যবস্থা নেই সেখানে পৌঁছবার।

তবে তাই চলো। পায়ে হেঁটে যেতে হবে তীর্থপতির কাছে। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। উপরে নীল নিঃসীম আকাশ। সোণালী রোদ্দুর। আর আছে মলয় অনিল। পথের সাথী বলতে তো এই।

সারদা চলছেন। চড়াই উৎড়াই পথ। বড় বড় তপ্ত মাটির ঢেলা। বড় দুঃসহ। বড় বেদনাবহ।

কিন্তু একটুও খেয়াল নেই সেদিকে। অভিসারে চলেছেন সারদা সব ক্লেশকে বিস্মৃত হয়ে।

ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। ফেটে যেতে চায় মাথা। দেহ যেন জ্বলে যাবে মনে হয়। ক্ষীণাঙ্গী সারদার মুখখানা গেছে শুকিয়ে। স্বেদ সিক্ত দেহ। কত আর বয়স হবে? মাত্র আঠারো। এমন করে কোনো দিন নামেনি পথে। এইতো প্রথম। শুধু পথ আর পথ। বিশ্রাম করবার মত একটা ছায়া শীতল তরু বীথিও পড়ে না দৃষ্টির দিগন্তে।

আর কত দূর!

ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়তে চায় দেহ। কোমল কমল-চরণ সারদার রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। পা পুড়ে যেতে চায় উত্তপ্ত মাটিতে। মাঝে মাঝে পা দুটো টলছে। টন টন করছে মাথার মধ্যে।

জ্বর এল। প্রবল জ্বর।

হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন সারদা। তাকিয়ে রইলেন শূন্য চোখে দিগন্ত বিসারী মাঠ। যেন ব্যবধানের সমুদ্র।

আমি অকিঞ্চন বলে পাব না কি তোমার করুণার স্পর্শ? এতদূর এসে যেতে হবে অদর্শনের বেদনা নিয়ে ফিরে?

সামনের একটা চটিতে গিয়ে উঠলেন মেয়েকে নিয়ে রাম মুখুজ্জে। বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছেন সারদা। জ্বরে দেহ পুড়ে যাচ্ছে। তন্দ্রা সারদা। ঘুমিয়ে পড়লেন এক সময়ে।

অচেতনের সমুদ্র শিয়রে কে এলে তুমি চেতনাময়ী?

সারদার শিয়রে বসল। হাত রাখল তাঁর তপ্ত দেহে। শীতল হয়ে গেল অঙ্গ। মাথায় হাত রাখল এক সময়ে। সারদার সব জ্বালা মুহূর্তে গেল জুড়িয়ে। ঘুম ঘুম চোখে জিজ্ঞেস করলেন সারদা, 'তুমি কে গা? কোথা থেকে এলে?'

এক পা ধূলো নিয়ে বসে পড়ল মেয়েটি বিছানার উপর। মাথায় হাত বুলোতে লাগল সারদার। জ্বর সেরে গেল।

অপলক তাকিয়ে থেকে একসময়ে বললেন সারদা, 'কেউ বুঝি তোমাকে পা ধুতে জল দেয় নি।'

কালো মেয়ে মধুর কণ্ঠে জবাব দিল, 'না বোন আমি এখনই চলে যাব। তোমাকে দেখতে এসেছিলাম। ভাল হয়ে যাবে। ভয় নেই।'

—তুমি কে গা? কোত্থেকে এসেছ?

'আমি তোমার বোন। দক্ষিণেশ্বর থেকে এসেছি।' দক্ষিণেশ্বরের নাম শুনে চমকে ওঠেন সারদা, 'দক্ষিণেশ্বর থেকে এসেছ? তিনি কেমন আছেন? আমার সেখানে আর যাওয়া হল না! তাঁকে দেখা হল না! তাঁর সেবা করা হল না!'

মেয়েটি বললে, 'সে কি গা! তুমি ভাল হয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাবে বৈ কি? তাঁকে দেখবে। তাঁকে তো আমি তোমার জন্যই আটকে রেখেছি।'

সারদার কণ্ঠে পরম তৃপ্তি, 'ও, তাই বুঝি!'

আবার ঘুমিয়ে পড়লেন সারদা। পরম নিশ্চিন্তের ঘুম। ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, পরম শান্তির অঙ্কে সারদা নিদ্রাশান্ত।

ভোর হয়। পাখী ডাকে। আলোয় উদ্‌ভাসিত হয় আদিগন্ত। ঘুম ভাঙ্গে সারদার। জ্বর নেই। এতটুকু গ্লানি নেই দেহে। এখন একটি নতুন মানুষ। আনন্দে হর্ষে মুগ্ধ সারদা। মনে পড়ে পূর্ব রাত্রির স্বপ্ন বৃত্তান্ত। শুরু হয় পথ চলা। বেশ কিছুটা পথ যেতেই পাওয়া গেল একটা শিবিকা। সারদা উঠে বসলেন। কিন্তু আবার এলো জ্বর। বাবাকে কিছু বললেন না। পথেই কেটে গেল সমস্তটা দিন। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছলেন রাত নটায়।

বাবার হাত ধরে একপা দুপা করে এগিয়ে চললেন সারদা। বুকের মধ্যে তুফান গর্জে উঠছে। যদি না কথা বলেন! যদি চিনতে না পারেন! যদি বিরক্ত হন! যদি বলেন তোমরা ফিরে যাও। তবে, তবে কি করব! কোথায় যাব?

মুখে কথাটি নেই সারদার। শ্বাস বইছে ধীরে। আবার নিজের দুর্বল মনকে সতেজ করে তোলেন সারদা—তোমার যা ইচ্ছে বল।

আমি এসেছি। এসেছি তোমার পায়ের কাছে ভিখারিণীর মত। পারতো ঠেলে ফেলে দিও। আমি যাব না। এখানে থাকব ঐ চরণ তলে। ও ছাড়া আমার ঠাঁই কোথায়?

রাম মুখুজ্জে মেয়েকে নিয়ে ঢুকলেন ঘরে। ওদের দেখেই এগিয়ে এলেন রামকৃষ্ণ। নম্রনতা সারদা যেন তাকাতে পাচ্ছেন না। ওষ্ঠ প্রান্ত শুষ্ক। বক্ষে অবাধ্য নর্তন। পা দুটো কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে।

সহসা রামকৃষ্ণের কণ্ঠে অভিব্যক্ত হল একটি সতৃপ্ত উক্তি, 'তুমি এসেছ? বেশ করেছ।'

ব্যস্তত্রস্ত হয়ে হাঁক ছাড়লেন, 'ওরে একটা মাদুর পেতে দেরে—'

এক ভক্ত ছুটে এল একটি মাদুর নিয়ে। পেতে দেন। বসলেন পিতা পুত্রী। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন রাম মুখুজ্জে জামাতাকে। কি অদ্ভুত দেহদ্যুতি! কি প্রশান্ত স্নিগ্ধ আঁখি! এ যে সেই রূপ! সেই কান্তি! সেই জ্যোতি!

ধীরে ধীরে রাম মুখুজ্জের নয়ন মুদে এলো। সেই একই মূর্তি। অন্তরে বাইরে একাকার হয়ে আছে। একটি নীরব প্রণতি। অন্তর দেবতাকে অদৃশ্য প্রণাম নিবেদন করলেন রামমুখুজ্জে।

সারদা দেখলেন যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। কোন পরিবর্তন হয়নি। কোনো বিভ্রান্তিকর কিছু ঘটেনি। কোথায় পাগলামো। এর চেয়ে সুস্থ সুন্দর মানুষ হয় নাকি? লোকের তো আর কাজ নেই, কেবল অখ্যাতি আর দুর্নাম। ভালো কথা যেন ওদের মুখেই আসতে চায় না।

সব দেখা দেখি হয়ে গেল সারদার। এবারে শুনতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মমতা মধুব কণ্ঠ, 'এখন কি আর আমার সেজবাবু আছে? আমার ডান হাত ভেঙ্গে গেছে। সে থাকলে তোমাকে আজ অট্টালিকায় রাখত!'

সরল সারদার কণ্ঠে একটি সহজ প্রার্থনা, 'আমি নবতের ঘরে গিয়ে থাকি ?'

সঙ্গে সঙ্গে বাধা, 'না-না, ওখানে ডাক্তার দেখাতে অসুবিধে হবে। এঘরেই থাকো।'

কত চিন্তা। কত দরদ। কত ভালোবাসা। অসুস্থ সারদাকে একেবারে কাছে কাছে থাকার নির্দেশ।

কি ভালো যে লাগে সারদার, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না। সারদার মনে আর কোনো আক্ষেপ নেই। উৎকণ্ঠা নেই। ক্রন্দন নেই। তিনি এখন শান্ত স্থির, ধীর। আসঙ্গের পূর্ণ কুম্ভটি তাঁর কানায় কানায় ভরা।

খাওয়া দাওয়া অনেক আগেই হয়ে গিয়েছিল সকলের। হৃদু মামীর জন্য নিয়ে এল মুড়ি। তাই খেয়ে শুয়ে পড়লেন সারদা। শুয়ে পড়লেন মাদুরের 'পর। সঙ্গে একটি মেয়ে শুল।

সারদামণির জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করলেন। করলেন আলাদা ভাবে পথ্যের ব্যবস্থা। দেখাশুনা করতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই।

জ্বর ছেড়ে গেল তিন চার দিনের মধ্যেই।

তোমার দর্শনে শান্তি। তোমার অদর্শনে অশান্তি। কোনো দিন আমাকে তুমি তোমার দৃষ্টির বাইরে রেখনা। আমি থাকবো তোমার দেউলের অনির্বান প্রদীপটি হয়ে। শুধু জ্বলব আর জ্বলব।

শ্রীমা বলেছেন, 'আগে মেঝেতে শুতাম, তখনো ঘুম আসত। এখন ভক্তেরা পালঙ্কে শোয়াচ্ছে। এখনো ঘুম আসে। কই কিছু তফাত বুঝিনা তো।'

নিদ্রা এলে শয্যার কি প্রয়োজন ? তেমনি অন্তরে ভালবাসার জোয়ার বইলে কি প্রয়োজন বেশভূষার ? আপনি মন বিভোর হয়ে যায়। মন বিভোর হলেই মনোময়-এর সমুপস্থিতি।

সারদা যোগযুক্তা। এতটুকু অশান্তি নেই তাঁর। স্বামীসেবা করেই ক্ষান্ত নন ক্ষান্তিময়ী। শাশুড়ির জন্যও কাজ করেন। করেন তাঁর সেবা যত্ন। আগে তো কুঠি ঘরেই থাকতো চন্দ্রমণি। এবারে নবতে। কেন? ঐ কুঠি ঘরে মারা গিয়েছে অক্ষয়ের ছেলেটা। মন তাই ভালো লাগেনা। ওখানে থাকতে পারছেন না যেন। তাই বললেন চন্দ্রমণি, 'না আর থাকবনা কুঠি ঘরে, এবারে থাকব নবত ঘরে। গঙ্গার পানে মুখ করে রইব। দরকার নেই আমার কুঠি ঘরে।'

ওদিকে ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়াচ্ছেন সারদামণিকে, ডাক্তার দেখাচ্ছেন। খোঁজ খবর নিচ্ছেন সব সময়ে। বলি এর চেয়ে সারদার সুখের দিন আর কি আছে?

'স্বামীর সঙ্গে গাছতলাও রাজঅট্টালিকা।'

এসেছে এক ভক্ত শ্রীমার কাছে। জানাল নালিশ। কি নালিশ?

—স্ত্রী আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না। দৃষ্টি দেয় না। থাকে উদাসীন।

মা বললেন স্ত্রীকে, 'স্বামীর সঙ্গে গাছতলাও রাজঅট্টালিকা।'

এক স্ত্রীভক্ত এসে বললে একদিন—আমাকে ও দেখতে পারে না।

সে কি কথা গো? 'স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে থেকো। দুজনে যেখানেই থাকো, সেখানেই রামরাজ্য।

রাধুর স্বামী মন্মথ চড় মেরেছে রাধুকে। রাধু এসে হাজির মার কাছে। কান্নায় ভেঙ্গে পরল রাধু। মা বললেন, 'কেন, কি করেছিলি?

রাধু বললে, 'গামছা ছুড়ে দিয়েছিলাম।'

মা নরম কণ্ঠে বললেন, 'একটা গামছা ছুড়ে মারলেই কি একটা চড় মারতে পারে?

সামনেই বসে এক ভক্ত স্ত্রীলোক। মা তার পানে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ বৌমা, এই রকম হয়?'

স্ত্রী ভক্তটি বলল, 'তা যদি রাধু রাগ করে গামছা দিয়ে থাকে, তবে তো স্বামী অমন ব্যবহার করতেই পারে।'

মায়ের চোখে বিস্ময়, 'তাই কি বৌমা?'

রাধুর পানে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'তোমাদের ও রকম হয়? ঠাকুরের সঙ্গে তো আমার কোনো দিন ওরকম ব্যবহার হয়নি, তাই ও সব জানি না। তা হলে রাধুরই দোষ! শোন, ঐ যে বৌমা বলে—স্বামীকে ওরকম করতে নেই।'

অনেক জ্বালা দিয়েছে রাধু মাকে এককালে।

রাধু একবার পাগল হল। শ্রীমা খাইয়ে দেয় রাধুকে। রাধুর কি মতলব, মায়ের গায়ে ছুঁড়ে মারে এঁটো। মা অতিষ্ঠ হয়ে যান। অবশেষে একদিন বলেই ফেলেন, 'দেখ মা, এ শরীর দেব শরীর। এতে আর কত অত্যাচার সহ্য হবে? ঠাকুর আমাকে ফুলের ঘা-টি পর্যন্ত করেন নি কখনো। তুমি ছাড়া তুই বলেননি। একদিন লক্ষ্মী ভেবে তুই বলে সে কি অপ্রস্তুত। তক্ষুণি জিব কামড়ে বললেন, 'ওমা, তুমি? কিছু মনে করোনি। আমি লক্ষ্মী মনে করে তুই বলে ফেলেছি।'

সব দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে গেল মুহূর্তে। এই তো পরম জন। আর পরম শান্তির আলয়। আমি আজন্ম তোমার হয়ে থাকব। তুমি আমাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত কোরনা।

ঠাকুর বললেন একদিন সারদাকে, 'আমি কি তোমাকে ত্যাগ করেছি?'

মধুর কণ্ঠে জবাব দিলেন সারদা, 'না, তুমি আমাকে গ্রহণ করেছ।'

আমি তো যুগে যুগে তোমার জন্যই আসি। তোমার হয়ে আছি। তোমার হয়েই থাকব।

॥ সাত ॥

জীবনটা কি

একখানা প্রশ্নপত্র।

প্রতিপলে, অনুপলে, দিনে রাত্রে কত প্রশ্ন, কত সমাধান। কত পরাভব। কত উত্তরণ। কখনো অকৃতকার্যতার বেদনায় ম্রিয়মান। কখনো বা সাফল্যের আনন্দে অধীর।

প্রতিটি জীবনের তো একই ধারা। কিন্তু ক'জনে তার হিসেব রাখে? কে দেখে তার জীবন ছন্দের গতি প্রকৃতির রহস্যকে।

কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই বিরাট প্রশ্নপত্রটির জবাব দিয়ে চলেছেন অটুট ভাবে। কত নিষ্ঠা। কত একাগ্রতা। তাঁর লেখা যেন আর শেষ হয়না। তাঁর কথা যেন আর ফুরোয়না।

ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীমৎ তোতাপুরী একদিন বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে, 'স্ত্রী-পুরুষে ভিন্ন দৃষ্টি, ভিন্ন ব্যবহার যার, সাধক হলেও ব্রহ্মবিজ্ঞান হ'তে সে বহুদূরে। যথার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হয়েছে তারই, যে স্ত্রীও পুরুষ উভয়কে সমদৃষ্টি আত্মা বলে জ্ঞান করতে পারে। স্ত্রী কাছে থাকলেও যার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ন থাকে, সে ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'

তাই তো? কথাগুলো শেলের মত বিঁধে রইল শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে।

স্ত্রীকে দেশের বাড়িতে রেখে কামজয়ের কথা বলা খুব সহজ। তাকে কাছে রেখে বলতে পার তবে তো!

এবারে এই জটিল প্রশ্নের জবাব দিবেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এবারে

আর দেশের বাড়িতে নেই সারদা। একেবারে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে। ডাকের মাথায়।

চন্দ্রমণি আর সারদা থাকেন নবতে। একদিন খবর পাঠালেন ঠাকুর, 'সারদা আমার ঘরে এসে শোবে।'

লজ্জায় লাল হয়ে গেল সারদার মুখখানা। কিন্তু চন্দ্রমনি এ্যাদ্দিন পরে ফেললেন স্বস্তির নিঃশ্বাস। মনে মনে ভাবেন—যদি এবারে দানা বাঁধে। যদি ঘর-মুখো হয় ছেলে! গদাধরের বুঝি মতি হল সংসারে!

আহা কি তৃপ্তি চন্দ্রমণির!

মার পানে তাকাতে পাচ্ছেন না সারদা। মনে মনে ভাবছেন—এ্যাদ্দিন পরে ওঁর হল কি! সরমে শঙ্কোচে সারদা স্তব্ধ।

যৌবনের ঢল নেমেছে সারদার অঙ্গে। প্রতিটি পাপড়ি প্রস্ফুট। গন্ধবহ।

এ যেন খরস্রোতা তটিনী। উদ্বেল। উচ্ছল।

অথচ স্বচ্ছ। সুন্দর। উত্তাপহীন। শীতল।

একটি পুরুষ চেতনাকে অর্চনার সমস্ত উপকরণে সজ্জিত তাঁর দেহ দেউল। বাসনা বিলোল মন। অধীর আকুল। যা অপেক্ষা, তা কেবল চন্দ্রমণির আদেশের প্রত্যাশায়। পেলেই যাত্রা করবেন তিনি সাগব সঙ্গমে।

একসময়ে বললেন চন্দ্রমণি, 'যখন ডেকেছে, যাও।'

এলেন সারদা—

এলেন চুপি চুপি আঁধারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ঠাকুরের ঘরে। দুরু দুরু বক্ষ। শ্বাস বইছে ঘন ঘন। মাঝে মাঝে শিহরিত হয়ে উঠছে সর্বাঙ্গ। কাঁটা দিচ্ছে। ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছেন। রামকৃষ্ণসংহিতার বাণীমূর্তি সারদা এসে দাঁড়ালেন ঠাকুরের মুখোমুখি। অচঞ্চল। অচপল সারদা। ধীর গম্ভীর। শান্ত সুন্দর। শুধু ঠাকুরের একটি মধুক্ষরা বাণীর প্রত্যাশায় অধীর।

এমনি এক পরম ও চরম মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণ শুধালেন, 'তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিতে এসেছো ?'

সারদামণির সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ভাববারও অবকাশ পেলেন না এক মুহূর্ত। সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন, 'না !'

'তবে ?'

যৌবনা যুবতীর কণ্ঠে ত্যাগের মন্ত্রোচ্চারণ হল। 'তোমাকে সংসার পথে টানব কেন ? তোমাকে ইষ্ট পথেই সাহায্য করতে এসেছি।'

ঠাকুর এবার একটি বাহু প্রসারিত করে দিয়ে বললেন, 'যদি তাই হয়, তবে এসো, আমার কাছে এসে বস।'

বসলেন সারদা রামকৃষ্ণের পাশে। তাকিয়ে রইলেন দুটি বিস্ময় ভরা চোখ তুলে। যেন একটি রজনীগন্ধার গুচ্ছ তমিস্রার বুকে আলোর মত জ্বলতে লাগল।

এক সময়ে অনেক ভেবে প্রশ্ন করলেন সারদা, 'ওগো, আমি তোমার কে ?'

ভাব-মুগ্ধ তাপস শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি আমার বাণী, বিদ্যা, সরস্বতী। তুমি আমার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, জ্যোতি। তুমি সারদা। তুমি অরূপ। তুমি সুন্দরী।'

ক্ষণ বিরতির পরে আবার বলতে লাগলেন ঠাকুর, 'যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও সম্প্রতি নবতে আছেন। তিনিই এখন পদ সেবা করছেন - '

বলতে বলতে আভূমি প্রণত হলেন রামকৃষ্ণ। মাথা রাখলেন জননী সারদার পায়ে। চমকে উঠলেন সারদা। কুণ্ঠিতার মত বললেন, 'ছিঃ' ও কি হচ্ছে ? আমি তোমার দাসী ' রামকৃষ্ণ বললেন, 'না, তুমি আমার আনন্দময়ী।'

মাতৃজ্ঞানে পায়ের ধূলি নিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এতেও পরিতৃপ্ত

হতে পারলেন না ঠাকুর। যাবেন তিনি আরো কাঠিন্যের দুজ্ঞেয় দুঃসাধ্যে। অথৈ উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপ দেবেন তিনি। পারে উঠতে পারলে পরীক্ষায় সাফল্য। নচেৎ সবই বৃথা।

রাত।

গভীর রাত।

চতুর্দিকে নেমে এসেছে নৈশ স্তব্ধতা। সাড়া শব্দ নেই। কোথাও কেউ জেগে নেই। কেবল নভস্থলে চাঁদ আর তাঁরার নির্বাক অবলোকন। ঝির ঝিরে হাওয়া বইছে। মাঝে মাঝে শোন যাচ্ছে গঙ্গার জলের উচ্ছ্বাস।

সারদা সুপ্তিমগ্না। রামকৃষ্ণ তাঁরই শিয়রে অতন্দ্র প্রহরী।

'ওরে মন, চেয়ে দেখ, দেখছিস ?'

আহা কি মধুর। যৌবনের ফোয়ারা। অপরূপ রূপ। অতসী অধরে নেশার মৌতাত। ছিলাটানা ধনুকের মত বাঁকা দুটো ভ্রূ। উন্নত নাক। সমতল বক্ষের দুধারে দুটি মঙ্গল কুম্ভ। কি নিটোল! কি সমুন্নত! যেন যৌবন সমুদ্রটা বারে বারে এসে আছড়ে পড়ছে ওখানে।

দেখ্, খুব ভালো করে চেয়ে চেয়ে দেখ্, দেহের প্রতিটি পাপড়িতে পাপড়িতে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্। দেখে নে। ভুল করিসনে। এমন স্নিগ্ধ মধুর আকর্ষণ আর কিসে আসে? হাতের মধ্যেই রয়েছে। যা খুশি করতে পারিস। ভাল করে ভেবে দেখ্, কি করবি! ছেড়ে দিয়ে শেষে ভেঙ্গে পড়িস নে আক্ষেপে।

ভাবনা কিসের? রুদ্ধ দ্বার। ভয় নেই। টেরও পাবে না কেউ। কেউ কিছু জানতে ও আসবে না। যা, এগিয়ে যা। কাছে—আরো কাছে। ঐ নিটোল স্তনবৃন্তে ফুলের মত ফুটে ওঠ্। মদনের সঙ্গে মিতালী কর। ডেকে তোল ঘুম থেকে। জড়িয়ে ধর। বুকের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ। একটুও ফাঁক থাকে না যেন। দুটি দেহ এক হয়ে

যাক। অঙ্গে অঙ্গ মিলিয়ে দে। প্রতি অঙ্গের কন্দর বৃন্তে ফুটে উঠুক তৃপ্তির চাঁপা হাসি।

'এরই নাম স্ত্রীর শরীর, লোকে বলে একে পরম উপাদেয় ভোগ্য বস্তু, লালায়িত হয় ভোগ করবার জন্য।'

ওরে মন, গ্রহণ করবি? না বর্জনের আনন্দে বধির হয়ে থাকবি? মালা পরাবি? না ফুল ছড়াবি? রতি পতি হবি, না মদনকে ভস্ম করে প্রেমময় নাম নিবি?

রামকৃষ্ণের মনের তটে এসে আছড়ে পড়ে খ্যাপা গঙ্গার ঢেউ। চঞ্চল হয়ে ওঠেন তিনি। শ্বাসের তোড়ে জাগে ঘন নিঃস্বন। রোমে রোমে জাগে শিহরন। থর থর করে কেঁপে ওঠে সমস্ত শরীর। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় কণ্ঠ।

কতক্ষণে এমনি করে বসে থাকবি পরম ভোগ্য বস্তুটি চোখের সামনে রেখে? এবার না হয় ঝাঁপিয়ে পড়। উত্তাল সমুদ্রের বুকে ঝড় তুলে দে!

আবেগে ফুলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। স্পন্দিত বক্ষ। আর যেন পারছেন না প্রশ্ন বাণে জর্জরিত হ'তে, 'কিন্তু উহা গ্রহণ করলে দেহেই থাকতে হয় আবদ্ধ। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।'

সহসা থমকে গেলেন। বিদিশার অন্ধকারে নাবিক যেন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। মন, যা খুশি তাই কর। আর পারছেন না চিন্তা করতে শ্রীরামকৃষ্ণ। পাচ্ছেন না কোনো সমাধান খুঁজে।

'কিন্তু কাম ভোগ ক'রে কি নিবৃত্তি হবে কামের?'

তা কি হয়!

তবে?

ও নেশা জুড়ায় না। ও মধু ফুরায় না। মত্ততার মগ্নতায় দুদিনেই শিব যায় শব হয়ে। তারপরে সব শেষ। ভোগে রতির বিস্তার। পশু মনের উদ্বোধন।

আর ত্যাগে ?

ত্যাগে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। অনন্ত সুখ। অশেষ তৃপ্তি।

ত্যাগের বৃন্তে যে ফুটে ওঠে ঈশ্বরের পদ পঙ্কজ।

ঝলসে উঠলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'না, না, তবে আমি চাই ঈশ্বরকে।'

এ কি তোর নিরেট নির্মল মনের কথা ?

'দেখিস যেন ভাবের ঘরে চুরি করিস নে।'

সময় কিন্তু এখনো আছে। এখনো কাটেনি তামসী রাত্রির তন্দ্রা। সারদা সম্মুখে। 'নাগালের মধ্যেই পড়ে আছে—ইচ্ছা হলেই ধরতে পারিস কিন্তু।'

পাহাড় ঘুরে গেল : শ্রীরামকৃষ্ণ ফিরিয়ে বসলেন মুখ। নিশ্চুপ, নির্বাক শ্রীরামকৃষ্ণ। অনড়, নিশ্চল। যেন প্রস্তর মূর্তি—স্থাণুর মত নিথর নিস্পন্দ। সর্বশক্তি সংহত হল চিত্তে। দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হ'তে লাগল স্নিগ্ধ জ্যোতি।

সহসা সজাগ হয়ে গেলেন সারদা, 'এখনো ঘুমাও নি তুমি ? রাত কত ?'

কোনো জবাব নেই মুখে।

চমকে উঠলেন সারদা। দরজা খুললেন। ত্রস্ত পদসঞ্চারে এলেন বাইরে। পেলেন কালীর মাকে। কম্প্র কণ্ঠে বলে উঠলেন সারদা, 'শীগগির ভাগ্নেকে খবর দাও! উনি যেন কেমন হয়ে গেছেন!'

হৃদয় ছুটে এলো। রাখল মামার কানে মাতৃমন্ত্র—মা-মা-মা! যে নামে অজ্ঞান, আবার সেই নামেই ফিরে এলো জ্ঞান। সদ্য জাগ্রত শিশুর মত তাকান রামকৃষ্ণ দুটি নিষ্পাপ আঁখি মেলে। কেমন যেন লজ্জা করছিল তাঁর। একটু অপ্রস্তুত হলেন। সারদার পানে তাকিয়ে আড়ষ্ট কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'আমাকে অমনি কাঠ হয়ে বসে থাকতে দেখে একা ঘরে তোমার খুব ভয় করছিল, না। শোন, অমন অনেক ভাব হয়তো হবে রাত্রে। তুমি ভয় পাবে না। কোন মন্ত্র জপ করে

কোন্ ভাব থেকে আমাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, তা সব তোমাকে শিখিয়ে দেব।'

কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন সারদা। ফেললেন স্বস্তির নিঃশ্বাস।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মনে এখনো প্রশ্নের মৃদু প্রভঞ্জন। এমন রূপ, এমন সুযোগ আর পাবিনে মন। এমন লোভনীয় দেহ! ক্ষতি কি একটু সোহাগে, আদরে বুকের মধ্যে টেনে নিলে? ওরে মন—এখনো প্রচুর সময় আছে। সারদার মুখোমুখি বসে রামকৃষ্ণ। চার চোখের মিলন হচ্ছে বারে বারে। 'কি জবাব দিবিরে মন?'

তুই জৈব চাস?

সহসা ভাবান্তর হল রামকৃষ্ণের, 'না, না, জৈব প্রয়োজন নয়—' তবে কি চাস?

চাই দৈব। দৈবই হবে আমার জীবনের ধ্রুবতারা। ধীরে ধীরে অতলায়িত হয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—অতলায়িত হয়ে গেলেন ধ্যানের অতলে।

॥ আট ॥

বান্ধবীরা বললে সারদাকে—

বললে একদিন, 'তুই কি হেঁদী না বোকা? ছেলে পুলে চাইতে পারিস্‌নে? স্বামীকে শক্ত ক'রে ধরতে পারিস্‌নে? গাঁয়ের মেয়ে বলে আহম্মকের মত থাকলে কি চলে রে?'

ছোট্ট একটি বিনম্র জবাব দেন সারদা, 'তা—আমি কি করলেম?'

ওরা ঝাঁজাল কণ্ঠে বললে, 'ধর্ম পত্নী হয়ে এমন অধর্ম করবি তুই?'

সারদার সরল মনে হয় বিস্ময়ের ছায়াপাত। মায়াভীরু দুটি চোখ তুলে তাকাল। অস্ফুটে কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে, 'অধর্ম!'

ওরা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'তাছাড়া কি? বিয়ে করেছ, অথচ সংসার ধর্ম পালন করবে না? এটা কি অধর্ম হচ্ছে না?'

শরতের এক ফালি সোনালী রোদ্দুরের মত নম্রনেত্রে সারদা এসে দাঁড়ালেন শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে। বললেন আড়ষ্ট কণ্ঠে, 'তাই তো, ছেলে-পুলে একটাও হবে নি, সংসার ধর্ম বজায় থাকবে কিসে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ আঁতকে উঠলেন—কে—কে—এই মন্ত্র রাখল সারদার কানে? কে শিখিয়ে দিল সরল সহজ মানুষটিকে হিসেব নিকেসের কথা?

আমি বুঝেছি গো, বুঝেছি, এ সবই তোমার ছলনা মা। তোমার ছলনা। চক্রান্তের চক্রে চক্রে ঘুরিয়ে আজ তুমি আমাকে টেনে নিতে চাচ্ছ নৈকট্যের মন্দিরে। 'ছিলে এ্যাদ্দিন বিশ্বরূপিনী আনন্দ স্বরূপিনী মা—আজ এলে স্ত্রীর রূপ ধরে। তুমি যদি পত্নী হয়ে আসতে পারলে,

তবে আর আমার শঙ্কা কিসের? নাও, আমাকে তোমার যেমন খুশি চাই করে নাও।'

আমি সব সাধনার ইতি খুঁজে
পেলাম তোমার মাঝে
তোমার পায়ের ধ্বনি আমার
বুকের মধ্যে বাজে।
তুমি আমার বেদ ও বিবেক স্মৃতি-শ্রুতি সব
তুমি আমার পাপ পূণ্য দুঃখ ও বৈভব।
তুমি শিব, তুমি কালী, কৃষ্ণ ও রাধিকা
তোমার মাঝে সদাই যেন—
আমার ভুবন রাজে।

তুমি আমার রস ও রসিক
পরা-প্রেম-রতি
তুমি আমার সুর-ছন্দ
তাল-মান-যতি।
তুমি স্বর্গ, তুমি নরক তুমি মন্ত্র গুরু
তুমি আমার শেষ ও অশেষ তুমি সাগর মরু।
তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, মুক্তি আরাধিকা
তোমার মাঝে আমায় দেখি নানা রূপের সাজে।

সারদামণির পানে তাকিয়ে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'তুমি মা হ'তে চাও?'

নিশ্চয়ই হবে। বিশ্বের হাজারো হাজারো লক্ষ লক্ষ মানুষ হবে তোমার সন্তান। মা ডাক শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে যাবে তুমি। সবার মা সারদামণি। বিশ্বজননী। জগদ্ধাত্রী।

দুটি ভাব বিহ্বল নয়ন মেলে সারদামণির পানে তাকিয়ে বললেন াকুর, 'বলো, আমায় সত্যি করে বলো, কোথায় নিয়ে যাবে— ংসারে?'

মধুক্ষরা কণ্ঠ সারদার, 'তা কেন নেব? আমি তোমাকে তোমার ষ্ট পথে চলতে সাহায্য করব।'

এইতো কথার মত কথা। জয় মা। জয় মা!

যা করার করিবে কালী
আমি কি তার জানি
দাসখতে করেছি সই
ব-কলম আনি।
তারই দেওয়া বিধি বিধান
সে যদি না করে প্রমাণ
আমার ঠেকা নেই তো কিছু
চিনি চরণ খানি।
এবার ভাবনা আমার নয় তো
ভাবতে হবে তার
দায় দায়িত্বের বোঝা বুঝি
নেই তো আমার আর।
সুখ-দুখ-মান-অপমান
জানে না তো আমার এ প্রাণ
পেলে রাঙ্গা চরণ দুটি
তবেই ধন্য মা।

আর কত পরীক্ষা নিবি? কত জটিল হয়ে থাকবি আমার দৃষ্টির অন্তরালে? আয় মা, সহজ হয়ে ধরা দে আমায় মনোমন্দিরে। এত নিষ্ঠুর তুই? উত্তাল উদধিতে ফেলে দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিস তুই?

আমি যে আর পারছিনে। 'ও যদি এত ভালো না হতো, আত্মহার
হয়ে তখন আমাকে আক্রমণ করতো, তা হলে সংযমের বাঁধ ভেঙে
দেহবুদ্ধি আসতো কি না, কে বলতে পারে।'

আমি তখন বিদিশার অমানিশায় দাঁড়িয়ে ব্যাকুল হয়ে আকুল কণ্ঠে
কেঁদে কেঁদে বলেছি, 'মা, আমার পত্নীর ভেতর থেকে কামভাব
একেবারে দূর করে দে মা।'

সাধন-সমরে বিজয়ী বিজ্ঞানীর মনের ক্রান্তিবৃত্তে এসে ছায়ার মত
সঞ্চারিত হয় অতীতের দিনগুলো। কত দুঃখ! কত বেদনা! কত
না নীরব অশ্রুর উজান বয়ে গেছে নয়নের তটে তটে। দিন গেল
মাসের পর মাস কাটল। মাকে দেখার সাধ মেটেনা। চোখের জল যে
আর শুকোয়না। চকিত বিদ্যুৎ ঝলকের মত মা দেখা দিলেন। আবা
চলে গেলেন অদর্শনের অন্তরালে। বিলাপে, বিক্ষেপে মুখর হ
উঠল দক্ষিণেশ্বরের বনকান্তার। নৈশ স্তব্ধতা ভেদ করে জেগে উঠ
সাধকের আর্ত আকুল কণ্ঠ। ঠিক এমনি একটা মগ্নতার উজান সাধে
সারদা এলেন গঙ্গার বানের মত রামকৃষ্ণের রুদ্ধ যৌবনে। জীবনে
নিকুঞ্জে ফুটল বসন্তের ফুল। কত সমারোহ সেখানে। কোকিলে
কুহুতান। ভ্রমরের মৃদু গুঞ্জন। আরক্তিম দিগন্ত। সমাহিত মে
এলো প্রবল চাঞ্চল্য।

সিদ্ধসাধক নিষ্ঠার পাল তুলে দিলেন আকাশে। তপঃ-বহ্নি
লেলিহান শিখায় উৎসর্গ করলেন আত্মইন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছার স
উপকরণ। অবশেষে ভেসে এলো দৈবী নির্দেশ—'ভাবমুখে থাক!'

দিন আর রাত্রি, রাত্রি আর দিন। কখন আসে, কখন যায় সে
খেয়ালটি পর্যন্ত থাকেনা শ্রীরামকৃষ্ণের। ভাবমুখে থাকেন ভক্ত
থাকেন তন্ময় হয়ে। মাঝে মাঝে ভগবান হয়ে যান। মানে আত্মরতি
সুখ সায়রে আত্মমগ্ন তাপস ধ্যেয় হয়ে ওঠেন। তখন বাহ্যজ্ঞান
থাকেনা। থাকেনা এ অবিদ্যার সংসারের নিয়ম নিষ্ঠার প্রতি বিন্দ

আসক্তি। মাকে পুজো করতে গিয়ে ফুল ছড়ান নিজের পায়ে। মাকে খাওয়াতে গিয়ে পুরে দেন নিজেরই মুখে। এ এক অদ্ভুত সুন্দর অবস্থা। দিব্য ভাবে বিভোর পাগল সদানন্দ পুরুষ। ভাবেন তিনি আনন্দ সরসীতে অহর্নিশি।

এত সব হয়ে যাবার পরেও আবার পরীক্ষা? পারলি নে তুই এখনো কোমল হয়ে, কমনীয় হয়ে আসতে! আমার কৌমার্যকে অটুট অক্ষুণ্ণ রাখতে দিবিনে তুই চঞ্চলা! আবার পরীক্ষার প্রহশন! বেশ তাই হবে। তোর সব প্রশ্নপত্রের জবাব দেব এবারে চূড়ান্ত ভাবে।

জ্যৈষ্ঠ মাস।

অমাবস্যার রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। এমন কালো রাত্রিকে কে পারে আলো করতে?

পারে?

কে?

আলো করতে পারে মায়ের তনুভা। তাই তো চলছে পুজোর আয়োজন, আয়োজন চলছে ঘরে আর বাইরে।

এ কি যেমন তেমন পুজো?

একে বলে ফলহারিণী কালীপুজো।

নির্জন নিশীথ রাত্রির আঁধার টুটে আভাসিত হবেন বিশ্বজননী। সাড়া দেবেন ভক্তের ডাকে। প্রকাশিতা হবেন মঙ্গলময়ী মূর্তিতে। তাঁর হাসিতে বিশ্ব হাসে। তাঁর বিষাদে জগৎ যায় অন্ধকার হয়ে।

১৮৮০ সাল।

হৃদয়রাম করবে পুজো মন্দিরে। আর রুদ্ধ দ্বারের অন্তরালে সঙ্গোপনে পুজো করবেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

হৃদয়ের ব্যস্ততার অন্ত নেই। ছুটে আসছে মাঝে মাঝেই। দেখে যাচ্ছে মামার আয়োজন কতটা কি হল। মুখে রা টি নেই। কেবল অবলোকন, আর বিস্ময়! কি করতে যাচ্ছে মামা? এ কি সম্ভব? কার চরণে দেবে পুষ্পার্ঘ্য কোথায়? কে নেবে মহেশ্বরের পুজো?

স্তব্ধ নিথর রাত্রি। কোথাও কেউ জেগে নেই। কেবল আকাশের ভালে তিতিক্ষিত নক্ষত্ররা জেগে। জেগে আছেন সপ্তর্ষি। তাঁদের চোখেও আজ ঘুম নেই। দেখবেন তাঁরা দিব্যাচারীর দিব্যারাধনা। বাতাসে মর্মর ধ্বনি নেই। আছে একটা চাপা নিশ্বন। গঙ্গার ঢেউগুলো আজ বড় গম্ভীর।

কে নেবে শ্রীরামকৃষ্ণের পুষ্পাঞ্জলি?

পুজো নেবেন জননী সারদা।

বিশ্বমাতৃরূপে সংস্থিতা হবেন তিনি। শক্তিরূপিনীকে শক্তিধ করবেন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। করবেন ষোড়শী পুজো। অমানিশায় তাঁ ফলহারিণী পূজোর আয়োজন করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

ছোট্ট একটি খবর পাঠালেন ঠাকুর—

খবর পাঠালেন সারদাকে।

কি খবর?

ঠিক রাত নটায় তুমি এসো।

আবার কেন ডাকাডাকি? একটি অব্যক্ত প্রশ্ন উঁকি দিল সারদা মনে। তবুও যখন ডেকেছে, যেতে তো হবেই। বলি এখন বাজে কটা?

নটা।

তবে তো আর দেরী করা যায় না।

তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে পড়লেন সারদা। চলে এলেন নবতে ঘরের মধ্যে চুপটি করে বসে আছেন ঠাকুর। ছুটো শব্দ হ দরজায়।

ঠাকুর উঠে খুলে দিলেন দরজা। বললেন, 'বোসো।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত বসলেন সারদা।

রামকৃষ্ণ তখন পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কথা বলছেন তিনি—তোমাকে আমি পুজো করব আজ।

সে কি গো?

হ্যাঁ, ঐ চরণ প্রান্তে রাখব জীবনের সবকিছু।

কি যে বলেন কিছুই বোঝেন না সারদা। নীরবে সব শ্রবণ করেন তিনি। তাকিয়ে থাকেন বিস্ময়ভরা চোখে। ঠাকুরের মুখে তখন উচ্চারিত হচ্ছে মন্ত্রের পর মন্ত্র।

—পশ্চিম মুখো হয়ে বোসো তুমি!

নিখুঁত ভাবে আজ্ঞা পালন করে চলেছেন সারদা। বসলেন তিনি পশ্চিমমুখো হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা গেল বন্ধ হয়ে।

ঠাকুর এলেন। বসলেন আসনে পূর্বমুখো হয়ে। চোখে চোখ রাখলেন দুজনে। হলেন মুখোমুখি। কিন্তু এতে নেই কোন মত্ততা। আছে এক অনির্বচনীয় আনন্দের অমৃত প্রস্রবন। বাহির দুয়ারে কপাট পড়েছে। খুলে গেছে অন্তরদ্বার। সেখানে নর ও নারী এক। পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ নেই কিছু। দুটি আত্মার আকাশে একই পরম সুন্দরের প্রকাশ।

সারদামণি তাকিয়ে আছেন। নবজীবনের শুভ-দৃষ্টি হয়ে গেল। হয়ে গেল জন্ম-জন্মান্তের আত্মজনের সঙ্গে নব পরিচয়। তন্ত্রে একেই বলে ষোড়শী পুজো। পশ্বাচার, বীরাচার, দিব্যাচার। এই তিনটি কৌল কর্মের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ভেদ করতে হয় ছয়টি চক্র।

সারদামণির চরণ যুগলে আলতা পরিয়ে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সিঁদুরের টিপ পরালেন ললাটে। নতুন বসনে ভূষিত করলেন অঙ্গ। মুখে বললেন, 'খাও—'

· রা টি পর্যন্ত নেই সারদামণির মুখে। মিষ্টি খাওয়া হয়ে গেল। ঠাকুর এবারে সারদামণির মুখে পুরে দিলেন একটি পানের খিলি।

ঠাকুরের মধ্যে জেগে উঠল সন্তান ভাব। এই তো পরম লগন। ঠাকুরের বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি সঙ্গে সঙ্গে সারদার মধ্যে আরোপ করলেন মাতৃভাব। ছেলে আর মা। মাতৃস্নেহে আজ ছেলে কত সোহাগ কত আদর করে খাওয়াচ্ছেন তাঁর মাকে। তাই তো মা ও দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তাঁর বালগোপালকে। পত্নীরূপান্তরিতা হলেন জননীতে। মাতৃরূপে সংস্থিতা হয়েছেন সারদা। মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন ঠাকুর উচ্চকণ্ঠে, 'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ, ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধি দ্বার উন্মুক্ত কর। ইহার শরীর-মনকে পবিত্র করে ইহাতে আবির্ভূতা হয়ে সর্ব কল্যাণ সাধন কর।'

ধীরে ধীরে জাগ্রত হল ঠাকুরের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। ধেয়ে গেল সহস্রারে। ঠাকুর তন্ময়, মন্ময় মুগ্ধ। মাতৃ দর্শনের আকুল আনন্দে মহাশক্তির চরণ পদ্মে জীবনের সর্ব বস্তু অকাতরে দিতে লাগলেন ইন্ধন। হাতের তাবিজ, রুদ্রাক্ষের মালা, ফুল, বেলপাতা, চুয়া, চন্দন, আবরণ, আভরণ, অবশেষে নিজের দেহটি পর্যন্ত নিবেদন করলেন মাতৃরূপিনী সারদামণির চরণ-তীর্থে।

বীরাচারী বীরপূজায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন অনায়াসে। এই তো ঠাকুরের শেষ পরীক্ষা। শ্রেষ্ঠ পূজো।

অনেকটা সময় হল অতিবাহিত। এলো রাত্রির দ্বিতীয় যাম। মহাজ্ঞানের প্রভাবে ভাবোন্মত্ত রামকৃষ্ণ করলেন আত্মনিবেদন, 'হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপে, হে সর্বকর্ম নিষ্পন্নকারিনী, হে শরণদায়িনী, ত্রিনয়ণী, শিবসোহাগিনী, গৌরী, হে নারায়নী, তোমাকে প্রণাম। তোমাকে প্রণাম।'

বারে বারে প্রণাম করতে লাগলেন পরমারাধ্যা শ্রীমাকে। মা তাকালেন একবার। করলেন মাতৃভক্ত ছেলেকে আশীর্বাদ। দুটি মুক্ত আত্মা যুক্ত হয়ে গেল একটি বৃন্তে। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ। শ্রীমার বাহ্যজ্ঞান শূন্য। এমনি ধারা কেটে গেল অনেকটা সময়। দুজনেই এলেন ফিরে। এবারে অন্য সম্পর্ক। অন্য ভাব। অন্য ভাবনা। সারদামণি শুধু সারদা নন, এবারে তিনি শ্রীমা। রামকৃষ্ণের শ্রীমা। বিশ্ব-সন্তানের শ্রীমা। জগৎ জননী শ্রীমা।

অদূরে শোনা যাচ্ছে গঙ্গার বুকে মহাজনি নৌকার মাঝিদের বৈঠের শব্দ ঝুপ-ঝাপ।

বনের বুকে শুরু হয়ে গিয়েছে ঝিঁঝিদের ঐকতান। আর রাত নেই।

তিনটি প্রহর গেল অতীত হয়ে। ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বললেন ঠাকুর শ্রীমাকে—এবারে ফিরে যাও নবতে।

ধীরে ধীরে বাইরে এলেন শ্রীমা। হঠাৎ খেয়াল হল, আমি তো প্রণাম করলেম না ওঁকে। ছি, ছি, এ আমি কি করলেম! মনে মনে নিবেদন করলেন বিশ্ব ভোলার উদ্দেশ্যে প্রণাম। চলে এলেন নবতে। নবজীবনের সূত্রপাত হল। চৈতন্যের সূর্য উঠল আর এক আকাশে। ত্রিবেণী সংগমের নিত্য স্নানযাত্রী জননী সারদা। সহস্রারে হল তাঁর স্বচ্ছন্দে গতাগতি। বিচিত্র ভাব। বিচিত্র রূপ! সত্যি মা আমার জগৎ জননী। পরম শক্তিস্বরূপিণী সারদামণি শ্রীমা।

॥ নয় ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের পূজো নিলেন জননী সারদা। পত্নীর পায়ে মাতৃজ্ঞানে মাথা রাখলেন ঠাকুর। ব্রহ্মজ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে করলেন আরোহণ। ঘুচে গেল নব ও নারীর ভেদ-জ্ঞান।

নবতে থাকেন শ্রীমা। ও তো নবত নয়, হয়ে উঠেছে মন্দির। শত শত হাজারো হাজারো ভক্ত সন্তান আসতে লাগল মাতৃদর্শনে। এ মৃন্ময়ী তনু নয়, একেবারে চিন্ময়ী মূর্তি। জীবন্ত, জাগ্রত, রক্ত মাংসে গড়া দেহ।

বাঙলার মরমী সাধকের প্রাণের টানে মা এসেছেন একান্ত মানবীয় ভাবে। তাঁর ঐশ্বর্যের কনকাসন থেকে নেমে এসেছেন ভক্তের পর্ণ কুটিরে। মুছিয়ে দিয়েছেন তাদের বেদনার্ত অন্তরের কান্নার অশ্রু।

এক ভক্ত এসেছে মার কাছে। শ্রীমা তাকে বললেন, 'বাবা, জানো তো, জগতের প্রত্যেকের উপর ঠাকুরের মাতৃভাব। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবারে রেখে গেছেন।'

কলকাতা থেকে এসেছে আর এক দল ভক্ত।

কেন ?

এসেছে মাকে দর্শন করতে। কিন্তু তারা দেখে তো অবাক। বিশ্বভুবনে বিস্তৃত যার আসন, তিনি আছেন এমন ঘরে! 'আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতা লক্ষ্মী আছেন গো। যেন বনবাস গো!'

ঠাকুর বলতেন, 'ধ্যান করবে মনে, বনে আর কোণে।' শ্রীমা যে

সেই কোণটিই বেছে নিয়েছেন। ঠাকুর তাঁকে ধ্যানের উপযোগীস্থান দিয়েছেন। তাই তো মা একদিন তাঁর ভাইঝিকে শুধালেন, 'নলিনী কি চাইবি ভগবানের কাছে?'

নলিনী বললে, 'কেন পিসিমা, জ্ঞান, ভক্তি, সুখ-সম্পদ—যাতে মানুষ সংসারে শান্তিতে থাকে—এই সব।'

মা কিন্তু ছোট্ট করে বললেন, 'না, চাইবার যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা নির্বাসন।'

ভগবানের কাছে কিছু চাইতে নেই। চেয়ে ঠকতে হয়। আমার কি চাই, কতটুকু চাই, তা তিনি যে আমার চেয়ে ঢের ভাল জানেন। তাঁর কাছে আবার চাইব কি? অবোধ অবুঝ শিশুর মত থাকতে হয়। মায়ের কাছে শিশুর কিছু বলতে হয় না। মা আপনিই তার যখন যা দরকার জুগিয়ে যান। এ ও ঠিক তাই। এত বড় বিরাট বিশ্বটা যিনি সৃষ্টি করছেন, তিনি তো আমারও স্রষ্টা। আমি যে তাঁর কোলেই শুয়ে আছি পরম শান্তিতে। পরম আনন্দে। তাকিয়ে আছি তাঁর মুখের পানে। এই তো আমার প্রাপ্তি। এই তো আমার তৃপ্তি। আমার যখন যা দরকার তিনি তা ঠিক দিয়ে যাবেন। তাই তো ঠাকুর রসিকতার ছলে বললেন শ্রীমা ও লক্ষ্মীকে, 'ওরে খাঁচায় শুক-সারীকে ফলমূল ছোলাটোলা কিছু দিয়ে আয়।'

ওরা চেয়ে তো আর খাবেনা। না খেয়েই কাটিয়ে দেবে দিন। নির্বাসনে থেকে থেকে সব বাসনাকেই দিয়েছে নির্বাসন। এখন আর ক্ষুধা তেষ্টার জ্ঞানটুকুও নেই। এমনই হয়। নামের সুধা নেশা ধরিয়ে দেয়। কোনো দিকে খেয়াল থাকে না। সব বোধ গিয়ে এক বোধী-মুলে মগ্ন হয়ে থাকে। তাই তো এমন ধারা।

ষোড়শী পূজায় মা পেয়েছেন শঙ্খ আর শাড়ি। কিছু অন্যান্য জিনিস। ওগুলো তো পরা যাবেনা। গুরুমাও নেই কেউ শ্রীমার। থাকতেন তো তাঁকে দেওয়া যেত।

কি করা যাবে এখন ?

সমাধান চাও।

কার কাছে ?

যিনি সর্ব প্রশ্নের সমাধান, তাঁর কাছে নিবেদন কর তোমার মনের কথা।

তাই করলেন শ্রীমা। গিয়ে দাঁড়ালেন ঠাকুরের কাছে। মনের মানুষ রাখেন মনের খবর। দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন ঠাকুর—বলে উঠলেন শ্রীমাকে—অতো ভাবনা কেন ? 'তা তোমার গর্ভধারিণী মাকে দিতে পারো। কিন্তু দেখো, তাকে যেন মানুষ জ্ঞান করে দিও না! দিও সাক্ষাৎ জগদম্বা মনে করে।'

শ্রীমাকে দেখতে এসেছে দল বেঁধে মেয়েরা। মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের চোখের পলক যেন আর পড়েনা। কি রূপ! কান্তি-ময়ীর কান্তি যেন ওদের মনের সব ভ্রান্তি দূর করে দিল। করজোড়ে বারে বারে প্রণাম করতে লাগল তারা। কিন্তু আধার ভেদে তো প্রকাশ। যেমন ভাল মাটিতে ভাল ফসল ফলে, তেমনি শুদ্ধ আধারে মায়ের অপূর্ব প্রকাশ ঘটে। মেয়েদের মধ্যে কয়েকজন ছিল নীরব দর্শক। তাদের মন মগ্ন হয়ে গিয়েছিল মায়ের পাদপদ্মে। কিন্তু কয়েকটি মনে উঁকি দিচ্ছিল অনুশোচনার অন্ধকার। তারা বলাবলি করছিল—এমন রূপ কোন কাজেই লাগল না। মেয়ে হয়ে জন্মে যদি সংসারই না পেল, তবে আর জীবন কি ?

ঠাকুর ওদের পানে তাকিয়ে সব বুঝে নিলেন। বদ্ধ হয়ে আছে ওরা বন্ধনের কারাগারে। প্রকৃতির দাসী হয়ে দিবানিশি সে রজ্জুর গেরোকে করছে আরো শক্ত। যিনি বিশ্ব সংসারের সারভূতা তার জন্য ওদের অনুশোচনা। দৃষ্টি নেই তাই দর্শনের দিগন্তে আঁধারের আবছায়া।

শ্রীমায়ের কাছে ছুটে গেলেন ঠাকুর। বলতে লাগলেন ভাবগম্ভীর

কণ্ঠে, 'ওরা সব হাঁস, পুকুরের চারধারে ঘুরে বেড়ায়, কি সব নিজেদের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করে। আমি সব শুনতে পাই। তুমি ওদের পরামশ শুননি বাপু। ওরা সব বলছে, আমার মন ফেরাতে ওষুধ পালা করো। দেখো বাপু, ওদের কথায় আমায় যেন ওষুধ-পালা কোরোনি। আমার সব আছে। তবে ভগবানের জন্য সব শক্তি তাঁকে দিয়ে রেখেছি—'

সঙ্গে সঙ্গে মা বলে উঠলেন, 'না গো না, সে কি কথা!'

তোমাকে বলতে হবে কেন ? আমি কিছু কি বুঝি না! যে যা খুশী বলুক, আমি তোমার সাধন পথে জেগে থাকব আজন্মের সঙ্গিনীর মত!

এলেন আর একজন সধবা স্ত্রীভক্ত। তাকে দেখেই মা কাছে ডাকলেন। বললেন, 'বোসো! কেমন আছ' ?

'আর আছি কই মা ? সংসার—সংসার করেই মরলাম। এ কাজ হলনা—সে কাজ হল না—কেবল এই চিন্তা দিবানিশি—'

মধুর কণ্ঠে মা জবাব দিলেন, 'কাজ করবে বৈ কি। কর্ম করতে করতেই কেটে যায় কর্ম বন্ধন। উদয় হয় নিস্কাম ভাবের। এক দণ্ডও কাজ ছাড়া থাকবে না।'

কর্মের মধ্য দিয়েই কর্ম-চ্ছেদ। কর্ম ছাড়া কিছু হবার নয়। যা কিছু করণীয়, সবই কর্মের দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে। এই যে পূজা অর্চা, তাও কর্ম দিয়েই করতে হয়। কর্ম কখনো জীবনকে পিছু টানে না। সে দেয় এগিয়ে যাবার প্রেরণা। তাই তো শ্রীমা বললেন, 'কর্মই হচ্ছে লক্ষ্মী।'

ঠাকুরও এই কর্মের প্রেরণা দিতে গিয়ে বললেন, 'মেয়েছেলে কি নিয়ে থাকবে ? রান্নাবাড়া নিয়ে থাকবে। সীতা রাঁধতেন। পার্বতী রাঁধতেন। দ্রৌপদী রাঁধতেন। স্বয়ং লক্ষ্মী রেঁধে খাওয়াতেন সবাইকে।'

শ্রীমা আবার বললেন, 'আমার মা বলতেন, যে খুব ভালো ক'রে রেঁধে বেড়ে লোকজনকে খাওয়ায় তার ঘরে মা অন্নপূর্ণার নিত্য বসতি।'

কিন্তু যার ঘর নেই, তাঁর আবার গৃহিণীপণা? সে কি কথা? বিশ্ব-সংসারের কর্তৃত্ব ভার যার হাতে তিনি নিপুণ সংসারী হবেন না তো কি? প্রচ্ছন্ন রূপ ধরে বন্দী হয়ে আছেন। লুকিয়ে আছেন কারার অন্তরালে। কিন্তু এ যেন ঠিক একটি কাঞ্চন—কুসুম। ওঁর দুটি আঁখিতে বিশ্বের চিরবর্ষা। ওঁর সারা অঙ্গে চির বসন্ত। কিন্তু মন? মন ত্যাগের গৈরিকে আবৃত। আত্ম নিবেদনের তুলসী পত্রে উৎসর্গীকৃত। এ যেন একটি কনক চম্পার বৃন্তচ্যুতি।

'তুমি সুদূর, অনন্ত, নীল। তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ অসীমে। তুমি কি নেমে আসবে পৃথিবীর এই বনরাজিনীলায়।

আকাশ বললে ধরিত্রীকে, 'আমি তোমারই'।

ঠাকুর বললেন শ্রীমাকে, 'ওগো, আমি কি কোথাও গেছি গা?'

হাতে তুলে একটুকরো তরকারি দেখালেন ঠাকুর বলরামকে। বললেন, 'ও নইলে কে আর এমন করে রেঁধে দিত বলো? হ্যাঁগো, তাই, নইলে কে আর এমন করে দেখত খাওয়াটা। সব রকম খাওয়া তো আর পেটে সয় না, আর সব সময় খাওয়ারও হুঁশ থাকে না। ও বোঝে, কি রকম খাওয়া সয়। এটা-ওটা করে দেয়, তাই ও যদি চলে যায়—মনে হয় কে করে দেবে।'

ক্ষুদ্র ঘরের কোণে থেকেও সারদামণি বিশ্বজননী। রাজেন্দ্রানী। তিন ভুবনের যিনি সম্রাট, তিনিই আবার কাঙ্গালের কাঙ্গাল। তাইতো শ্রেষ্ঠী এবারে ভিখারি।

ছোট ছোট কথা। ছোট ছোট উপদেশ। ঠাকুর বললেন শ্রীমাকে, 'সাবধানে যাবে। নৌকায়, রেলে কিছু ফেলে টেলে যেওনা।'

কথাটি ছোট, কিন্তু তার বিস্তার ভুবনময়। বীজটি থাকে ছোট, কিন্তু তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অরণ্যের সঙ্গীত। শ্বেত শুভ্র একটি শঙ্খের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে বিরাট বিশাল সমুদ্রের কলকল্লোল।

ঘরের কোণে বসে থাকেন সাধারণ একটি স্ত্রীলোক। সাজেন পান।

বেলেন রুটি। করেন ভাত রান্না। কে বোঝেন, এই সাধারণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অসাধারণ ঐশ্বর্য ?

এলো এক ভক্ত। জিজ্ঞেস করল শ্রীমাকে, 'এই যে তোমাকে দেখছি সাধারণ স্ত্রীলোকের মত বসে বসে রুটি বেলছ, এর মানে কি ? একি মায়া ?'

মায়ের মুখে চুমু দিল এক ফালি স্নিগ্ধ হাসি, 'মায়া বৈ কি ? মায়া না হলে আমার এ দশা কেন ? আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী হয়ে থাকতুম।'

এসেছে বাগ্দি পাড়ার অম্বিকা বাগ্দি। অম্বিকার একটি পদ আছে। সে জয়রামবাটির চৌকিদার। মা তাকে ডাকেন অম্বিকাদা বলে। সেই অম্বিকা একদিন মার কাছে এসে চুপি চুপি বললে, 'লোকে আপনাকে বলে দেবী, ভগবতী, কিন্তু কই, আমি তো কিছু বুঝতে পারি না।''

মা হেসে বললেন, 'তোমার বুঝে কাজ নেই। তুমি আমার অম্বিকা দাদা। আমি তোমার সারদা বোন।'

হাটবে তো সহজ পথ ধরে হাটো। রচনা ক'র না ব্যবধানের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। আমি দেবী, আমি বিরাট, এ কথা যে দিন হবে তোমার বোধগম্য, সেদিন থেকেই তুমি সরে যাবে দূরে। বহু দূরে। মনের নেপথ্যে এসে দাঁড়াবে ভীতি মিশ্রিত শ্রদ্ধা। ভাই—বোনের অনাবিল স্নেহ ভালবাসার অন্তরঙ্গতার মধ্যে গড়ে উঠবে মানব দেবতার সম্পর্ক। অতশত জটিলতায় কাজ কি বল ? তার চেয়ে আমি থাকব তোমার আজন্মের বোন হয়ে। আর তুমি থাকবে আমার যুগ যুগান্তরের অম্বিকা দা !

এই একই জিজ্ঞাসা নিয়ে আর একদিন হাজির হল এসে চন্দ্রদত্ত, 'মা, কত দুর দেশ থেকে কত লোক আসে তোমাকে দর্শন করতে। তুমি তো ঘরের ঠাকুরের মত পান সাজছ, সুপুরি কাটছ, ঘর ঝাঁট দিচ্ছ।

তোমাকে দেখি কিন্তু কই আমি তো কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

মা বললেন, 'চন্দ্র, তুমি বেশ আছ। আমাকে বুঝে তোমার কাজ নেই।'

এক স্ত্রীভক্ত এসে বলল একদিন, 'আপনি যে ভগবতী তা আমরা বুঝতে পারিনা কেন ?'

মা বললেন, 'সকলেই কি আর ঠিক ঠিক বুঝতে পারে মা ?

এই কথা বলে মা একটি গল্প ফাঁদলেন, 'ঘাটে একখানা হীরা পড়েছিল। সব্বাই পাথর মনে করে তাতে পা ঘষে স্নান করে উঠে যেত। একদিন এক জহুরী সেই ঘাটে এসে দেখে যে সেখানে একখানা প্রকাণ্ড হীরা !

এও ঠিক তাই। 'যন্ত্র যদি পড়ে থাকে লক্ষ জনার মাঝে
যন্ত্রী না হলে যন্ত্র কেমন করে বাজে।

তাই হীরা চিনতে হলে চাই পাকা জহুরীর দৃষ্টি। দেবী দেখতে হলে লাগে চর্ম চোখ নয়, মর্ম চোখ। মানে, মানস নেত্র। সে ভাগ্য কি সবার হয়। এ যে সাধন লব্ধ ধন। আরাধনার বস্তু। মা, মাগো বলে কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে ডাকতে হবে তাঁকে। তবেই সাড়া দেবেন তিনি।

এগিয়ে দিবেন দুখানা অভয় হস্ত। তুমি তখন ঝাঁপিয়ে পড়বে সেই চিরসন্তাপহারিণীর সুশীতল অঙ্কে। আধো আধো ঘুম ঘুম চোখে দেখবে মায়ের মুখ। মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে পান করবে সুধা নিসিক্ত স্তন।

॥ দশ ॥

শ্রীমা ফিরে এলেন—

ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বর থেকে জয়রামবাটীতে।

কিন্তু এখানে এসে ঘটল এক অঘটন। পিতৃবিয়োগ হল শ্রীমার। ব্যথায় ভেঙ্গে পড়লেন। দুঃখের সফেন সমুদ্রটা উঠল গর্জন করে। শ্যামাসুন্দরীর ললাট থেকে মুছে গেল এয়োতির চিহ্ন। দীর্ঘশ্বাস আর হতাশায় দীর্ণ হল তাঁর বক্ষ। নীরব কান্নার অশ্রুর উজান তাঁর পঞ্জরে পঞ্জরে তুলে দিল বেদনার ঝড়।

এমন শোকের দিনেও অন্ন চিন্তা তাঁকে যেন আরো দুর্বল করে দিল। কি করে চলবে সংসার? কে জোগাবে অন্ন? কি করে জুড়াবে পেটের ক্ষুধা?

যিনি কাঁদান, তিনিই আবার মুছিয়ে দেন চোখের জল। যিনি ফেলে দেন, তিনিই আবার টেনে নেন কোলে।

সুখ-দুঃখের মালিক তো একজনই। দুঃখ দেন ভগবান। কাঁদান তিনি। কিন্তু এই অঝোর কান্নার মধ্যেই তিনি তুলে ধরেন না কি একটি তৃপ্তির সুধা-সিন্ধু? ভগবান মানুষকে তার কর্ম ভোগের জন্য নিক্ষেপ করেন একটা তিমিরান্তক তন্দ্রার মধ্যে?' কিন্তু সে কালো রাত্রির মধ্যেও তিনি কি দেন না একটি সন্তোষ—সকালের ইঙ্গিত।

সুখ, দুঃখ দুই তাঁর। অশ্রুও তাঁর। হাসিও তাঁর। দুঃখেও তুমি। কান্নায়ও তুমি। হাসিতেও তুমি। আনন্দেও তুমি। তুমি ছাড়া তো কিছু নেই। তবে আর ভাবনা কি? পাল তুলে দাও নৌকায়। শুধু হাল

ধরে বসে থাকো। তাঁর যে দিক খুশী নিয়ে যাক। সব ভাবনা তাঁর। সব দায় তাঁর। তুমি আমি শুধু হুকুমের দাস।

শ্যামাসুন্দরীর মন অনেকটা শান্ত হল। সর্ব দায় দায়িত্ব তাঁর কাঁধে তুলে দিয়ে তিনি হলেন মুক্ত।

আমি আকাঙ্খার আর্তিতে আন্তরিকতার সুধা বারি ঢেলে তোমাকে ডাকব। ডাকব অশ্রু কুসুমের অর্ঘ্য সাজিয়ে। তুমি নিয়ে যেও আমাকে আমার গন্তব্য স্থানে। এই শুধু। আর কিছু জানিনে।

মা তখন দক্ষিণেশ্বরে।

থাকেন নবতের ছোট ঘরে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার রজত রাত। শ্রীমা করজোড়ে বললেন, 'আমার মনটি ঐ জোছনার মত নির্মল করে দাও।'

প্রবাহিতা গঙ্গার পানে তাকিয়ে কান্নাঢালা কণ্ঠে বললেন, 'চাঁদে কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোনও দাগ না থাকে।'

বাইরের দুঃখ হাহাকার, সংসারের কষ্ট, নানা কথা ভেবে ভেবে মা একটু বিচলিতা হয়ে পড়ছিলেন। তাই আরও বেশী করে মনে পড়তে লাগল মায়ের কথা। জয়রামবাটি থেকে এখানে ফিরে আসার পর মনও বিশেষ ভাল নেই। বাবার কথা মাঝে মাঝেই মনে পড়ে। অতীতের স্মৃতিগুলো প্রহরীর মত এসে দাঁড়ায় চোখের সামনে। দু চোখে নামে অবাধ্য অশ্রু। তার পরে আবার বরিশাল থেকে এক ভক্ত লিখেছে এক চিঠি। তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। আশা নেই বাঁচবার। মাকে একবারটি শেষবারের মত দেখতে ইচ্ছা তার। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? ভক্ত আকুল ভাবে নিবেদন করেছে—তুমি এসে একবার আমাকে দেখা দিয়ে যাও!

ভক্তের আকুল কান্না মাকে বিশেষ ভাবে করল বিচলিত। তিনি একখানা ফটো পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন, 'বাবাজীবন, ভয় নেই, তোমার অসুখ সেরে যাবে। আমার যে ফটোটি পাঠালাম তাই দেখো—'

নাম ও নামীর মতই ছায়া ও কায়াও অভেদ। ফটোখানা পেয়ে পরম আনন্দে ভরে গেল ভক্তের অন্তর। মন্থর হল রোগের গতি। বারে বারে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগল। অশ্রু দিয়ে ধুয়ে দিতে লাগল করুণাময়ীর চরণ যুগল।

মায়ের করুণা যে অপার। যে যা মনে প্রাণে তার কাছে প্রার্থনা করে, সে-ই তা পায়।

মাঠে এক কণা ফসল নেই। খাঁ খাঁ করে মরুভূমি যেন। চাষীরা বসেছে মাথায় হাত দিয়ে। একটিও বীজ ফেলতে পারেনি জমিতে। কি করে ফেলবে। এক বিন্দু বৃষ্টি নেই। শুকনো মাটিতে ফসল তো আর ফলে না। মাঠ ঘাট তেতে আগুনের মত।

চাষীদের দুঃখ মাকে কাঁদাল। জল ঝরা চোখে মা বললেন, 'ঠাকুর, এ কি করলে? এরা না খেয়ে মরবে?'

মায়ের কান্না মেটাল মৃত্তিকার তৃষ্ণা। কোথা থেকে ভৈরব গর্জনে আকাশ ভেঙ্গে নামল যেন জলের ধারা। এমন অঘটন ঘটল সেই রাত্রেই। মাটি ভিজল। চাষীর মুখে ফুটল প্রাণরক্ষার হাসি। বীজ বুনল। সোনার ফসলে বইল হাওয়ার তুফান। অজন্মার দেশে এল ফসলের বান।

ঠাকুর পারেন না রাত্রে ঘুমাতে। একবিন্দু নিদ্রা নেই নয়নে। কেবল কান্না আর আকুলতা। রাত ভোর হতে না হতেই পড়েন উঠে। চলে আসেন নবতে। ডাকেন লক্ষ্মীকে। বলেন, 'ও লক্ষ্মী, ওঠ এখন। তোর খুড়িকে ডেকে দে। আর কত ঘুমুবি? রাত পোহাতে চলল। মার নাম কর।'

মা লাফিয়ে ওঠেন। সেরে ফেলেন প্রাতঃকৃত্য। নবতে আসেন।

মার পানে তাকিয়ে ঠাকুর বলেন হৃদুকে ডেকে, 'ওরে হৃদু, আমার বড় ভাবনা ছিল, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—কে জানে এখানে কোথায় শৌচে যাবে। হয়তো লোকে নিন্দে করবে। আর তখন লজ্জা পাবে। তা,

ও কিন্তু এমন, কখন যে কি করে কেউ টেরও পায় না। আমিও কখনো দেখলুম না বাইরে যেতে।'

শ্রীমাকে বললেন ঠাকুর, 'বুনো পাখি খাঁচায় থাকলে যেতে চায়। মাঝে মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে।'

নবতে বড় কষ্টে আছেন মা। ভক্ত শম্ভু মল্লিকের চোখে পড়ল। তিনি একটুকরো জমি কিনলেন মন্দিরের লাগোয়া। কাপ্তেন পাঠাল শালকাঠ। তৈরী হল চালা ঘর। মা নবত ছেড়ে চলে এলেন চালা ঘরে।

কাজ কর্মে কোনো ক্লান্তি নেই মার। পাকা গৃহিনী যেন। সারা দিন কাজ করেন। রাত্রে শ্রান্ত দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শুয়ে পড়েন শ্রীমা। ঠাকুরের জন্য নিজের হাতেই করেন রান্না। ঝি দেয় জোগান।

ঠাকুর কিন্তু নীরবে সব দেখেন নিজের চোখে। মনে মনে খুশীও কম হন না। গাঁয়ের মেয়ে। তাঁর কাছে এতটা প্রত্যাশা ছিল না। কিন্তু এ একেবারে অন্যরকম। বলার অপেক্ষা রাখেননা। সব কাজ সেরে রাখেন নিপুন ভাবে।

সেদিন হল এক কাণ্ড। সূর্য গিয়েছে অস্ত সুপ্তির ঘরে। চাষীরা ফিরছে ঘরে কাঁধে লাঙ্গল নিয়ে। ঠাকুর এলেন মন্দির থেকে বাইরে। কি যেন ভাবলেন একটু। তার পরেই ঢুকে পড়লেন সারদার চালা ঘরে। মা তো অবাক। এ আবার কি? কাশীতে ভুমিকম্প যে!

ঠাকুর মধুর হেসে বললেন—'এলাম তোমাকে দেখতে।'

বাইরে শুরু হল বৃষ্টি। অঝোর ধারা-বর্ষণ।

ঠাকুর আর ফিরতে পারলেন না মন্দিরে। রাতটা থাকতে হবে তাঁকে এই চালা ঘরে সারদার সঙ্গে। তাই বললেন, 'তবে এখানেই চাট্টি রেঁধে খাওয়াও।'

অন্নপূর্ণার মন্দিরে এসেছেন নারায়ণ। তাঁকে অভুক্ত রাখতে

পারেন নারায়ণী? খুব ভাল করে রাঁধলেন সারদা। রাঁধলেন ঝোল-ভাত। পরম যত্ন ভরে কাছে বসে খাওয়ালেন ঠাকুরকে।

ভেবেছিলেন ঠাকুর বৃষ্টি থামবে খাওয়া দাওয়ার মধ্যে। কিন্তু বৃষ্টি আর ধরল না। ঠাকুর মাকে বলতে লাগলেন, 'বুঝলে, সেই যে কালী ঘরের বামুনরা রাত্রে বাড়ি যায়, এ যেন ঠিক তেমনি হল। তাই না?'

রসের ঠাকুর রসিকতা করলেন শ্রীমার সঙ্গে। একটু সহজ হয়ে সুন্দর হয়ে পরমা প্রকৃতির সঙ্গে করলেন লীলা বিলাস। এ যেন শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জে রজনী যাপন।

কিন্তু মাষ্টার মশাই বললেন অন্যকথা। দুর্গাপূজার সময়ে এক ভক্তকে বললেন তিনি, 'দর্শন করেছ মাকে? মহামায়া দেহ ধারণ করে কত ভক্তকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেছেন। যাও, মহাষ্টমী কালই, কিছু পদ্মফুল নিয়ে তাঁর পাদপদ্ম পূজো করে এস।'

এমন আর হবেনা। পরম সৌভাগ্যে আমরা এবারে দেবীকে পেয়েছি মানবী হিসেবে।

মাষ্টার মশাইর নির্দেশ মত কাজ করল ভক্ত। গেল বাগবাজার-মঠ বাড়িতে। কিন্তু পড়ল বড় হতাশ হয়ে।

কেন?

ভক্তটির যেতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছে। বেলাও কম হয়নি। প্রায় দুপুর। এ বেলায় আর দর্শন দেবেন না মা কোনো পুরুষ ভক্তকে।

তবে উপায়?

বিকেলে দেখা হবে তো?

তাও ঠিক বলা যায় না। কারণ মা অসুস্থ।

পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। বরফ লাগাচ্ছে মায়ের পায়ে। তাছাড়া বিকেলে কেবল স্ত্রীভক্তদের দর্শন দেবেন শ্রীমা।

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল ভক্তের। অন্তর কেঁদে উঠল। চোখ

ছুটো ছল ছল করছে। নিরাশার বালু বেলায় দাঁড়িয়ে আকুল কণ্ঠে নিবেদন করল অন্তরের অরুন্তুদ আর্তি—মা, তবে কি তুই আমাকে দেখা দিবিনে? আমি অকিঞ্চন বলে তুইও কি থাকবি অদর্শনের অন্তরালে? ছেলে কাঁদলে মা মুছিয়ে দেয় তার চোখের জল। তুই আসবিনে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে কোলে টেনে নিতে?

আকুল ভক্ত। আর্তিতে আক্ষেপে ভরে উঠল তার অন্তর। এমনি সময়ে তুজন স্ত্রী ভক্ত মাকে দর্শন করে ফিরছিল। তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে। কি করে যাবে!

—তোমরা কেউ যাবে এখন ঐ পথে?

ভক্তটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—আমি যাব।

সঙ্গী পেয়ে গেল স্ত্রীলোক তুটি। আর ভক্ত পেল তার অন্তরের তন্‌হা মেটাবার স্থযোগ।

কি করে?

তোমাকে না পাই, তোমার চরণ ছুঁয়ে যারা ধন্য হয়েছে তাদের ছুঁয়ে আমি অর্জন করব মাতৃ-পরশের পূণ্যি।

এমন যার অন্তর, তাকে মা দেখা না দিয়ে পারেন।

একটি অভয়ের আহ্বান ভেসে এল তার কানে। মা ডাকলেন ভক্তকে। সিঁড়ি বেয়ে ভক্ত ত্রস্ত পায়ে উঠে গেল উপরে। মায়ের পায়ে প্রণাম রাখল। রাখল ফুলের অর্ঘ্য। তুটি চোখ ফেটে আবেগে আনন্দে নামল পুলকের অশ্রু।

মা ভক্তটির পানে একবার তাকালেন। বললেন যেন কাকে, 'হ্যাঁ, এর দ্বারাই হবে। একে প্রসাদ দাও।'

ভক্ত ধন্য হল। মা তার হাতে তুলে দিলেন একটি টাকা ও একখানা নতুন কাপড়। ধীরে ধীরে মাকে প্রণাম করে নেমে এল ভক্ত। স্ত্রী ভক্ত তুজনকে পৌঁছে দিল তাদের গন্তব্য স্থানে।

সেখান থেকে ভক্তটি সটান চলে এলেন মাষ্টারমশাইর কাছে। সব

কথা বলল খুলে। কিন্তু একটা আক্ষেপ তার, 'মার সঙ্গে তো কোনো কথা হল না!'

বললেন মাষ্টার, 'কথা হয়নি কি বলছ? মা লক্ষ্মী চেয়েছেন মুখ তুলে, তোমার কি চাই আর?'

বলতে বলতে নতুন কাপড়খানা মাষ্টারমশাই বেঁধে দিলেন ভক্তের মাথায়। বললেন, 'সাক্ষাৎ জগজ্জননীকে দর্শন করেছ সশরীরে। তোমার মানব জন্ম সফল হল।'

মা, তোমার চরণ দুখানাই তীর্থকৃত্যের ব্রহ্মলোক। তোমার পরশনই সুধা সিন্ধুতে অবগাহন। তোমার কণ্ঠস্বরই এক আকাশ অভয়-আশ্বাস!

॥ এগারো ॥

লোক-শিক্ষা আর লোক-দীক্ষার জন্য হয়েছে এবারে মায়ের আগমন। মানুষ হয়ে এসেছেন তো ঠিক মানুষের মতই আচার আচরণ।

ছোট চালা ঘরে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শ্রীমা। শম্ভু মল্লিক ডাকল ডাক্তার। বদ্যিও এলো। ব্যবস্থা হল ঔষধ পথ্যের। ঠিক তাদের নির্দেশ মত সেবা যত্ন। কিন্তু একটুও পরিবর্তন নেই। রোগ কমছে না কিছুই।

ঠাকুর বললেন এসে—একবার ঘুরে আস বাবার বাড়ি থেকে। স্থান পরিবর্তন করলে সুফল কিছু ফলতে পারে। হয়তো সুস্থ হয়ে উঠবে।

তোমার নির্দেশই তো রোগ-মুক্তির ইঙ্গিত।

জয়রামবাটিতে এলেন শ্রীমা।

কিন্তু এখানে এসে রোগ গেল আরো বেড়ে। তাছাড়া ডাক্তার বদ্যি নেই এখানে। মহাবিপদে পড়লেন শ্রীমা। আর যেন সহ্য হচ্ছেনা কষ্ট। যন্ত্রণায় ক্লান্ত হয়ে পড়ল দেহ। বারে বারে শৌচে যান। হেঁটে যান কলু-পুকুরের পাড়ে। বড় খারাপ লাগে। কিছুই যেন ভাল লাগেনা। পা চলতে চায় না তবুও ঘুরতে থাকেন। চোখে অন্ধকার দেয়। আর কিছু মনে থাকেনা। একেবারে অজ্ঞান। শুয়ে পড়েন শ্রীমা। শুয়ে পড়েন কলু-পুকুরের ধারে। তৃণাচ্ছাদিত শ্যাম শয্যায় এলিয়ে দেন কনক-দেহ।

আর একদিন মা দেখলেন তাঁর প্রতিবিম্ব জলের মধ্যে। আঁতকে উঠলেন। একি চেহারা! এ দেহ রেখে আর কি হবে?

ওরে মন আর কেন? এবারে পিঞ্জরের বন্ধন ছেড়ে দে। মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে উড়ে যা আকাশে। মনে মনে একরকম ঠিক করে ফেললেন দেহ আব রাখবেন না।

এমনি সময়ে কে একটি মেয়ে এল। ধরল এসে মায়ের হাত খানা। বলল—চল ঘরে যাবে। এখানে পড়ে আছ কেন? মেয়েটি মায়ের হাত ধরে নিয়ে গেল ঘরে।

এবারে শেষ চেষ্টা। সিংহবাহিনীর মণ্ডপে হত্যা দিবেন শ্রীমা। জাগ্রত দেবী। মা প্রার্থনা করলেন—আমার দেহ থেকে রোগ-ক্লান্তি দূর করে দাও। হয় প্রার্থনা মঞ্জুব কর, নয়তো তোমার পায়ের নীচে চির জন্মের আশ্রয় দাও। আর পারিনে এ অশান্তি ভোগ করতে।

'ব্যাধির ঔষধ না মিললে এখানেই অনশনে প্রাণত্যাগ করব।'

সিংহবাহিনীর দুয়ারে পড়ে রইলেন শ্রীমা। বেশ কিছুটা সময় হ'ল অতিক্রান্ত। সহসা শুনতে পেলেন মা, 'মন্দিরের ছাঁচতলার মাটি খাও, রোগ সেরে যাবে।'

যেমন দৈব নির্দেশ তেমনি কাজ। শ্রীমার দুরারোগ্য রোগ সেরে গেল দেবীর কৃপায়। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল সিংহবাহিনীর মাহাত্ম্য।

কষ্টে ক্লিষ্টে সংসার চালান শ্যামাসুন্দরী। অভাবের যন্ত্রণায় ক্লান্ত শ্রান্ত তিনি। ছেলেরা এখনো ছোট। যজন যাজনের বয়স হয়নি। তাই কায়িক শ্রমের বিনিময়ে চালাতে হচ্ছে তাঁকে সংসার।

শ্রীমাও তাঁর সাধ্য মত সাহায্য করেন মাকে। কাটেন পৈতা। তা থেকে যা দু চার পয়সা আসে তা শ্যামাসুন্দরীর হাতে তুলে দেন শ্রীমা।

গাঁয়ে কালীপূজা হয় প্রতিবারেই। শ্যামাসুন্দরী অনেক কষ্টে জমা করেছিলেন পূজার জন্য কিছু চাল। কিন্তু গ্রামের এক হিংসুটে লোক শ্যামাসুন্দরীর সে চাল করল প্রত্যাখান। বড় ব্যথা পেলেন শ্যামাসুন্দরী। চোখ ফেটে কান্না এলো। কালীর চাল! এ চাল খাবে কে? কোন কাজে লাগবে এ তণ্ডুল?

রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন শ্যামাসুন্দরী—এক রক্তবর্ণা দেবী এসে বলছেন, 'ও চাল আমি খাব। তোমার কোনো চিন্তা নেই।'

শ্যামাসুন্দরী ঘুম ঘুম চোখে শুধালেন, 'কে তুমি?'

শুনতে পেলেন উত্তরটি, 'এর পরে যার পূজা হয়।'

রাত ভোর হল। শ্যামাসুন্দরী বললেন সারদাকে, '—এমন সব দেখলাম। বল তো এর পরে কার পূজো হয়।'

শ্রীমা বললেন—ও রূপ শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রীর।

পূজো করলেন শ্যামাসুন্দরী জগদ্ধাত্রীর। সবাই হল সে পূজোয় আমন্ত্রিত। পরম তৃপ্তি ভরে প্রসাদ পেল। বিসর্জনের দিনে মৃন্ময়ী মূর্তির কানে কানে বললেন শ্যামাদেবী, 'মা দুর্গাই আবার এসো।'

বছর ঘুরে এলো। এলো পূজোর দিন। সারদাকে বললেন শ্যামা দেবী, 'পূজোর জন্য তুমি কিছু দিও।'

অভাবের তাণ্ডবে অস্থির সারদা একটু বিরক্তির সুরেই বললেন, 'অত ল্যাঠা পারব না। হ'ল একবার, বেশ হ'ল, আবার বছব বছর কেন?'

শ্যামাসুন্দরী ব্যাথা পেলেন চিন্তারও বিরাম নেই। পূজো এসে গেছে। কি যে হবে।

রাত্রে শ্রীমা দেখলেন এক অদ্ভুত স্বপ্ন।

কি সে স্বপ্ন?

দুটি সখী নিয়ে সারদার সামনে দাঁড়িয়ে এক দেবী মূর্তি। তিনি বলছেন সারদার পানে তাকিয়ে, 'তবে কি আমরা চলে যাব?'

শ্রীমা শুধালেন, 'কে তোমরা?'

দেবী বললেন, 'আমি জগদ্ধাত্রী।'

ভক্তিমন্থ অন্তরে বললেন সারদা, 'না মা, তোমরা কোথায় যাবে? তোমরা থাক, পূজো করব। তোমাদের যেতে বলিনি।'

সেই থেকে প্রতি বছর হয় শ্রীমাব বাবার বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজো। প্রত্যেক বছর পূজোয় আসেন মা। বড খাটুনি। বাসন মাজা থেকে সব কাজ করতে হয় নিজের হাতে।

মায়ের একান্ত অনুগত ছেলে যোগীশ। পূজোর জন্য এক পয়সা দু পয়সা করে সংগ্রহ করেন সারাটা বছর ধরে। তাতে জমেছে ছশো টাকা। যোগীশ তাই থেকে কিনল এক সেট কাঠের বাসন। যদি মায়ের শ্রম কিছুটা লাঘব হয়। বাসন নিয়ে এসে বলল যোগীশ, 'মা, তোমাকে আর বাসন মাজতে হবে না।'

শুধু তাই নয়, তিন শ টাকা দিয়ে তিন বিঘে জমি কিনল যোগীশ মায়ের জন্য। ও থেকেই চলে যাবে প্রতি বছরের পূজোর খরচ। লেপ তৈরী করে দিল শ্রীমাকে। এমন সোনার টুকরো ছেলেও অবশেষে বিদায় নিল।

বিয়ে করেছিল যোগীশ। অন্তিম মুহূর্তে মা নিয়ে এলেন যোগীশের স্ত্রীকে। বললেন সেবা কর স্বামীর। কিন্তু যোগীশ অটল। সে নেবেনা • কারো সেবা। কিন্তু মায়ের নির্দেশ আর ফেলতে পারল না। বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হল স্ত্রীর সেবা। যাবার পূর্বে মা বললেন যোগীশকে, 'ওকে দু একটি কথা বলো।'

ক্ষীণ কণ্ঠে যোগীশ বলল, 'না আমি পারব না। সে সব আপনি বুঝুন।'

যোগীশ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। নরেন বললেন, 'কড়ি খসল। এবারে ধীরে ধীরে বর্গাও সব খসে পড়বে।'

মা বললেন, 'বাড়ির একখানা ইট খসল, এবারে সব যাবে।'

যোগীশের স্মৃতি মাকে পীডা দেয়। সদা সর্বদা মনে পড়ে তার কথা। ভুলতে পারেন না যোগীশকে। ও যেন মায়ের কোলে শুয়ে আছে পরম তৃপ্তির শয্যায়।

*　　　　*　　　　*

ঠাকুর আছেন দক্ষিণেশ্বরে। একা। খাওয়া দাওয়া নিয়ে বড্ড অসুবিধে। খেয়ালের মানুষ। তাঁর কি কোনো হুঁশবোধ আছে! যত কষ্টই হোক, তিনি সদানন্দ পুরুষ। যেন কোনো অভাবই অভাব নয়।

কিন্তু মায়ের মন আকুল হল। তিনি মনে করলেন,—যাবেন। গ্রামের একদল স্ত্রী পুরুষ যাচ্ছেন গঙ্গা স্নান করতে কলকাতায়। মা তাদের সঙ্গী হলেন। এলেন আরামবাগে। ওদের ইচ্ছা সন্ধ্যার মধ্যে তারকেশ্বর পর্যন্ত যাবে। কারণ পথ ভাল নয়। এর পরেই তেলো-ভোলার মাঠ। সেখানে বড্ড ডাকাতের উপদ্রব। পেলেই হল। যা পাবে তো নেবেই। তার পরে জানে খতম। লাশ গুম। তাই সকলের পদবিক্ষেপই এস্ত। ধিন ধিন করে এগিয়ে চলেছে সব। দুক্রোশ পথ হল অতিক্রান্ত। মা পড়লেন ক্লান্ত হয়ে। আর যেন পারছেন না পথ চলতে। সাথীরা বারে বারে তাকাতে লাগল পেছন

ফিরে। অপেক্ষাও করল দু একবার। কিন্তু তীর্থ করতে এসে প্রাণ খোয়াবে কে ?

শ্রীমা কিন্তু বেশ বুঝতে পারলেন, তারা মনে মনে একটু বিরক্ত। তাই বিনা দ্বিধায় বলে দিলেন তিনি—তোমরা এগিয়ে চল। তারকেশ্বরে গিয়ে অপেক্ষা কর চটিতে। আমি ধীরে ধীরে আসছি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তারা। চলল এগিয়ে। মা পড়ে রইলেন একা। চলার বিরাম নেই। ধীর মন্থর গতি। সন্ধ্যা এল ঘনিয়ে। পথ অন্ধকার। দৃষ্টির দিগন্তে আসে ঘোর ঘনিয়ে। তবুও চলেন মা। চলেন রাত্রি রূপে রাত্রির আঁধার ঠেলে।

সহসা কি হল! এক বিরাটকায় পুরুষ। হাতে লাঠি। এগিয়ে এল মায়ের কাছে। দাঁড়াল পথ রোধ করে। বজ্রদৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কে যায় ?'

ভাবনাহীন জবাব, 'তোমার মেয়ে গা। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে তোমার জামাইয়ের কাছে যাচ্ছি।'

ঠিক এমনি সময়ে দেখতে পেলেন ধীরে ধীরে একটি মেয়েছেলে এগিয়ে আসছে। শ্রীমা তাকে পেয়ে বলে উঠলেন, 'মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, কি বিপদেই না পড়েছিলাম। সঙ্গীরা ফেলে গিয়েছে। ভাগ্যি তোমরা এসে পড়লে তাই রক্ষা!'

শ্রীমায়ের স্নেহমন্থ কণ্ঠস্বর বাগ্‌দী ডাকাতের অন্তরে জাগাল সাড়া। ডাকাত স্ত্রীর অন্তর পরিপ্লুত হল মাতৃস্নেহের মধুর মমতায়। হিংস্রতার পরিবর্তে ওদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হল স্নেহ শান্তির সুধা রস। অপলক বিস্ময় তাদের চোখে মুখে। শ্রীমা ডাকাত স্ত্রীর হাতখানা ধরলেন পরম নির্ভয়ের আশ্রয় স্থল ভেবে।

আর কি থাকতে পারে তারা কাঠিন্যের শীলা কন্দরে ? অভয়ের হস্ত প্রসারিত করে দিল ডাকাত বউ। মধুর কণ্ঠে বলল—তোমার ভয় নেই। দয়া করে যখন দেখা দিলে, আর ছাড়ছিনে তোমাকে।

গাঁয়ের এক দোকান থেকে মুড়ি কিনল। বিছানা করে দিল ডাকাত বউ। মুড়ি খেলেন শ্রীমা। শুয়ে পড়লেন। অতন্দ্র প্রহরীর মত সারদার শিয়রে বসে ঘুম পাড়াল। বাগ্‌দী ডাকাত সারাটা রাত দাঁড়িয়ে রইল বিনিদ্র প্রহরীর মত। পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রইলেন সারদামণি।

ভোর হল। ডাকল কাক। পূবের দিগন্তে পড়ল আলোর আল্পনা। পাখীরা পাখা মেলল আকাশে।

শ্রীমার ঘুম ভাঙ্গল। বাগ্‌দী ডাকাত ও তার স্ত্রী সারদাকে সঙ্গে করে চলল দক্ষিণেশ্বরে। পথ আর পথ।

তারকেশ্বরের পথ। দুধারে সমুদ্র সবুজের দোলা। ফলেছে কত কড়াই। সারদা পথ চলছেন, আর ছোট্ট মেয়ের মত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছেন।

এতক্ষণে এসে পৌঁছল ওরা তারকেশ্বরে। ডাকাতের স্ত্রীর মনে মাতৃস্নেহের উদয় হল, 'কাল সারারাত কিছু খায়নি আমার মেয়ে। যাও বাবা পূজো দিয়ে চট করে বাজার করে এস। মাকে একটু খাওয়াই ভালো করে।'

খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল। আবার সুরু হল পথ চলা। শ্রীমাকে মিলিয়ে দিল সঙ্গীদের সঙ্গে। তারা দেখে তো অবাক। ভেবেছিল সারদা আর ফিরবে না। পথেই পড়ে থাকবে তাঁর ক্ষত-বিক্ষত মৃত দেহটা। কিন্তু কি অপূর্ব খেলা। বাগ্‌দী ডাকাত ও তার স্ত্রীর পানে তাকিয়ে ওরা জিজ্ঞেস করল,—'এরা কারা?'

শ্রীমা বললে,—'মা, বাবা। মাঠের অন্ধকারে এঁরা যদি কাল না এসে পড়তেন কি যে হত ভাবতেও পারিনি।'

যাত্রীরা চলল এবারে বস্তিবাটির পথে। সারদা সঙ্গ নিল। কিন্তু কান্নায় অভিভূত হন ডাকাত ও তার স্ত্রী। শ্রীমা ওদের কাঁদতে শেখালেন। এদ্দিন ওরা শুধু মানুষকে কাঁদিয়েছে। নির্মমভাবে

হেনেছে আঘাত। আজ তাদের পাষাণ অন্তর গলে গলে হল বর্ষা। সারদাও কেঁদে ফেললেন। ডাকাত মায়ের পানে তাকিয়ে ধরা গলায় বলল, 'যদি পায়ের বোঝা স্ত্রী না সঙ্গে থাকতো, তোমাকে বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতুম।

বাগদীমা সারদার আঁচলে বেঁধে দিলেন কিছুটা কড়াই শুঁটি। বললেন বিদায় মুহূর্তে, 'মা সারু, রাত্রে যখন মুড়ি খাবি তখন খাস এই শুঁটি।'

শুঁটি বাঁধছে আর কাঁদছে বাগ্‌দী স্ত্রী। ক্রমে দু দল দু দিকে চলল। হাটে আর ফিরে ফিরে তাকায়। এ যেন কিসের একটা টান ওদের জীবনকে করে তুলেছে মোহ মধুর। ওরা চোখ মোছে আর পথ চলে।

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছলেন শ্রীমা। সব কথা বললেন ঠাকুরকে। ঠাকুর মধুর হেসে জবাব দিলেন, ও যে 'ডাকাতরূপী নারায়ণ।'

কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই ওরা এসে হাজির হল দক্ষিণেশ্বরে সঙ্গে এনেছে মোয়া আর নাড়ু। ওগুলো মেয়ে জামাইয়ের। শ্রীমা পরম আদর করে ওদের বসালেন। বললেন, 'তোমরা আমাকে এত স্নেহ কর কেন?'

সহজ সরল একটি জবাব, তুমি তো সাধারণ মেয়ে নও। তোমাকে যে আমরা কালীরূপে দেখলুম।'

'সে কি গো?'

'সত্যি দেখলুম মা। আমরা পাপী বলে এখন তুমি রূপ গোপন করছ।'

শ্রীমা বললেন, 'কি জানি বাপ, আমি তো কিছু জানি না।'

এক পতিতা এসেছে মায়ের কাছে। প্রার্থনা করছে মায়ের কৃপা। মা কিন্তু পারলেন না পতিতা বলে তাকে দূরে ঠেলে রাখতে। নিলেন কোলে টেনে।

এ নিয়ে কথা উঠল। পতিতা আসবে। মন্দিরে ঢুকবে। এতে কি মন্দির কলুষিত হয় না?

মন্দিরকে কলুষ মলিন করে এমন সাধ্য কার। এখানে এলে যে কলুষ নাশ হয়। আবিল ধুয়ে যায়। মা বললেন, 'ওরা আমার কাছে আসবে না তো কার কাছে আসবে? আমি কাউকে বাদ দিতে পারব না। ঠাকুর বলেছেন, এবার আমি কাউকে ছাড়ছি না। ঠাকুর কি কেবল রসগোল্লা খেতে এসেছেন?'

এসেছে এক বিপথগামী কুলবধূ। কাঁদছে—অনুশোচনার আগুনে জ্বলে পুড়ে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে। মা স্নেহ মাখা কণ্ঠে ডাকলেন, 'এসো মা, ঘরে এসো। পাপ যখন বুঝতে পেরেছ তখন আর পাপ নেই। এসো, তোমাকে মন্ত্র দেব। ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দাও। ভয় কি?'

আবার কোথেকে এল সব থিয়েটারের অভিনেত্রীরা। নিয়ে গেল শ্রীমায়ের আশীর্বাদ।

সবাই চেনে বাগবাজারের পদ্মবিনোদকে। পাড়ায় মাতাল বলে তার কুখ্যাতি। এই পদ্মবিনোদ মাঝে মধ্যে আসে বলরাম মন্দিরে। শরৎ মহারাজ তাকে ডাকে দোস্ত বলে।

সে দিন এক কাণ্ডই ঘটল। রাত। মা শুয়েছেন দোতলায়। নীচে রয়েছেন শরৎ, আশুতোষ এবং আরো অনেকে। সহসা এ'কি হল? সবাই উৎকর্ণ। রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে ভেসে এলো একটি কণ্ঠস্বর—'দোস্ত! দোস্ত!'

পাড়ার মধ্যে রাত দুপুরে ডাকাডাকি! কিন্তু পদ্মর কি ছাই সে খেয়াল আছে?

শরৎ বুঝতে পারলেন। সবাইকে বলে দিলেন—কেউ সাড়া দিও না।

পদ্মবিনোদ তখন বলতে লাগল, 'আমি ব্যাটা এত রাত্তিরে এলাম,

আর দোস্ত, তুমি একবারটিও উঠলে না। জানালার পাখা খুলে দেখলেও না একবারটি।'

বলতে বলতে আবার পথ চলতে লাগল টলে টলে। এবারে আর দোস্ত নয়, মা, মা বলে কাঁদছে পদ্মবিনোদ। বলছে আকুল করা কণ্ঠে, 'মা, ছেলে এসেছে তোমার, ওঠো মা।'

কোনো সাড়া নেই দেখে পদ্মবিনোদ কাঁদোন ধোয়া কণ্ঠে গান ধরল সেই স্তব্ধ রাত্রির নিঝুম প্রহরে—

ওঠো গো করুণাময়ী, খোল গো কুটির দ্বার
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার।
সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ সুখে অন্তঃপুরে ;
আমি ডাকিতেছি মা-মা বলে, নিদ্রা কি ভাঙ্গে না তোমার ?'

করুণাময়ী আর পারলেন না থাকতে। উঠে বসলেন শয্যায়। খুলে দিলেন জানালা। আকুল ভক্তের তৃষিত বক্ষ জুড়ালেন দর্শন দিয়ে। পদ্মবিনোদ আনন্দে আত্মহারা। নেচে কুঁদে বলতে লাগল, 'উঠেছ মা ? সন্তানের ডাক কানে গেছে ? উঠেছো তো পেন্নাম নাও।'

মায়ের দর্শন পেয়ে পদ্ম রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে লাগল। শ্রীমা বললেন, 'দেখেছ জ্ঞানটুকু টনটনে।'

কে যেন প্রতিবাদ করল—জ্ঞান থাকলে কি ঘুম ভাঙ্গাত আপনার ?

মা বললেন, 'তা করুক, ওর ডাকে যে থাকতে পারিনে। দেখা দিই।'

॥ বারো ॥

দুর্ভেদ্য দুর্গে আছেন দুর্গা প্রতিমা। জগৎ-জননী হয়েছেন কারাগারে বন্দিনী। এ কি কম কষ্ট?

আপন শক্তি চেপে রেখে গোপন করে চলেছেন পরিচয়। ঠিক মানুষের মত মানুষের ঘরে ঠাঁই নিয়েছেন সারদা। দিচ্ছেন জীবকে শিক্ষা আর দীক্ষা। শেখাচ্ছেন ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্তির পন্থাটি।

দরমা-ঘেরা ঘরে থাকেন সারদা। কিন্তু মনটি পড়ে থাকে পতির পায়ে পায়ে। শ্রীরামচন্দ্র নির্বাসনে পাঠালেন সীতাকে। কিন্তু সীতার ধ্যান জ্ঞান হয়ে উঠল—রাম-রাম।

এও ঠিক তাই। কত দুঃখ, কত কষ্ট, কিন্তু সর্বক্ষণের জন্যই সারদার মনটি লগ্ন হয়ে আছে শ্রীরামকৃষ্ণে।

হৃদু একদিন তামাসা করে বললে, 'ও মামী, তুমি মামাকে বাবা বলে ডাকতে পার না?'

মধুর কণ্ঠে জবাব দিলেন সারদা, 'বাবা কি বলছ—পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, স্বজন সবই তিনি।'

প্রতিটি পুষ্পে তাঁর পায়ের চিহ্ন। প্রতিটি মনে তাঁর আহ্বান সঙ্গীত। প্রতিটি চোখে তাঁকে দেখবার আকুল আকুতি। তিনি নেই কোথায়? আর তিনি কি নন? তিনি সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন। সব কিছুকে জড়িয়ে আছেন।

নবতে পশ্চিম বারান্দায় একদিন বসেছেন ঠাকুর। সারদার মুখোমুখি। শিব আর শিবানী। চার চোখের মিলন হল। ভাবের জোয়ার এসে হৃদয়ের কপাট ভেঙ্গে দিল সারদার। মন্থিত অন্তর। জেগে

উঠল নাম। বেগবতী পাহাড়ী নদীর মত চলল নামের বন্যা। নয়ন মুদে জপ করতে লাগলেন সারদা।

শুধু কি জপ? না সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রার্থনাও জেগে উঠল সারদার অন্তরে। চাঁদের পানে তাকিয়ে রইলেন অপলক। বললেন ধীর কণ্ঠে, 'তোমাতেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু আমি যেন নি-দাগ থাকি।'

ঠাকুর মঞ্জুর করলেন প্রার্থনা। সারদার জিহ্বের' পর লিখে দিলেন একটি মন্ত্র। একে দিলেন কুল-কুণ্ডলিনীর সঙ্গে ষট্‌চক্র।

ভেদ করতে হবে এই ছয়টি চক্রকে। হতে হবে পাপমুক্ত। বাঁধতে হবে সেই নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষকে। তবেই হয়ে গেল। তখন কুল-কুণ্ডলিনী হবেন তোমার আজ্ঞাবহ। অনন্ত শক্তির অধিকারিণী হবে তুমি। অপরাজেয় হবে তোমার কৌল-শক্তি।

বললেন একদিন সারদামণি—

বললেন যোগেন-মাকে, 'ওকে একটু বলতে পারো, যাতে আমার ভাবটাব হয়! লোকের জন্য যেতে পারি না ওঁর কাছে। তুমি তো যাও, বলবে।'

কথাটি একদিন বললেন যোগেন-মা ঠাকুর কে। ঠাকুর নীরব। বসে রইলেন স্তব্ধ হয়ে। যোগেন-মা আর কোনো কথা বলতে সাহস পেলেন না।

কিন্তু একদিন যোগেন-মা দেখলেন এক অপূর্ব দৃশ্য। এসেছেন নবতে। কিন্তু দরজা ভেতর থেকে রুদ্ধ। যোগেন-মার মনে কৌতুহল জাগল। তিনি একটি ছোট্ট ফাঁক দিয়ে অতিকষ্টে তাকালেন। আঁতকে উঠলেন। এই যে সিদ্ধা যোগিনী। পরমা প্রকৃতি জননী সারদা।

সম্মুখে রয়েছে পূজার উপচার। সারদা কখনো হাসছেন। কখনো কাঁদছেন। কখনোবা নীরবে নিথর হয়ে যাচ্ছেন পাষাণ মূর্তির মত। এই না ভাব-সমাধি? গাঢ় ভাব সমাধি হলে বাহ্যিক জ্ঞান

ম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। কপাট পড়ে বাইরের দুয়ারে। খুলে যায় ন্তর দ্বার। তখন কেবল—তুমি-তুমি-তুমি-তুমি। আকাশে, আত্মায়, লে, পল্লবে, বাতাসে, বার্তায় এক অখণ্ড পরম শ্রেয় রূপ ধরে সদা রাজ কর। ঘুরে বেড়াও আমার চোখে চোখে। সে যে কত প্রিয় প তা কি বোঝান যায়। ঐ রূপেই আমি মগ্ন। আমি তন্ময়। তখন য়িত আর দেবতা পতি আর প্রতিমায় কোনো ভেদ থাকে না।

যোগেন-মা সেদিন বেশ শক্ত করে ধরলেন শ্রীমাকে, 'তবে যে লছিলে, তোমার নাকি ভাব হয় না।'

লজ্জার লাবণ্যে সারদার মুখে দেখা দিল এক অপূর্ব সৌন্দর্য। মুখে থাটি বললেন না। ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলেন যোগেন-মা। কি প। এ যেন স্নিগ্ধতার রজত চন্দ্র।

মায়ের সঙ্গে একই বিছানায় শুয়েছেন যোগেন-মা রাত্রে। একটু মোতে পারলেন না। কত ধ্বনি। কত মগ্নতা। যে বাঁশী শুনে শ্রীরাধা য়েছিলেন শ্রীমতি, গৌরচন্দ্র হয়েছিলেন উন্মনা, এ যে সেই-সেই পাগল রা বাঁশরিয়ার বাঁশরী। যোগেন-মা নীরব। সারদামণি মাঝে মাঝে াসছেন। আবার কাঁদছেন। যোগেন-মা অবাক। আলগা হলেন। সময় ছুঁতে নেই। ঠাকুর পূর্ণ করে দিয়েছেন সারদার অন্তর। ভাব চয়ে হয়েছে তাঁর পরম লাভ।

আজকাল মাঝে মাঝে ভাব হয় শ্রীমার। সমাধিস্থ হয়ে যান। লরাম বোসের বাড়িতে হয়েছিল তাই। মা মহাজ্ঞানের তীর্থ থেকে ফিরে এসে বললেন, 'দেখলুম কোথায় যেন চলে গেছি। সেখানে মামার যেন সুন্দর রূপ হয়েছে। রয়েছেন ঠাকুর। কারা যেন আমাকে আদর যত্ন করে ডেকে নিয়ে বসিয়ে দিলেন ঠাকুরের পাশে। সে য কি আনন্দ, বলতে পারি না। একটু হুঁশ হতে দেখি, শরীরটা াড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি ওই বিশ্রী শরীরটার মধ্যে কি করে ঢুকবো—'

ঠিক এমনি আর একদিন সমাধি থেকে ফিরে এসে বলতে লাগলে
শ্রীমা 'ও যোগেন, আমার হাত কই, পা কই ?'

একটি মেয়ে এসে বললে মাকে,' 'নিজের নিজের কাজকর্ম ক
খাটো পেটো, তা হলেই সব হবে, একি সত্যি ?'

মা বললেন, 'বা, কাজকর্ম করবে বৈ কি, কাজে মন ভাে
থাকে। তবে জপ ধ্যান প্রার্থনারও বিশেষ দরকার। অন্ততঃ সকা
সন্ধ্যে একবার বসতেই হয়। ওটি হোল যেন নৌকার হাল।'

একটু থেমে আবার শুরু করলেন বলতে, 'সন্ধ্যা বেলা বসলে সম
দিন ভালোমন্দ কি করলাম না করলাম তার একটা বিচার আসে
গত দিনের মনের অবস্থাটির সঙ্গে আজকে দিনটির অবস্থা এক
তুলনা করা যায়। আর ধ্যান ? জপ করতে করতে ধ্যান করবে ই
মূর্তির। শুধু মুখ নয়, পা থেকে সমস্ত অঙ্গ। কিন্তু জপ ধ্যা
করলেই কি সব হয়ে গেল ? মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কিছু
হবার নয়। শুধু পথ ছেড়ে দেবার জন্য জানাতে হয় প্রার্থনা। প
ছেড়ে দেবার জন্যই স্মরণ-মনন।'

ক্ষণবিরতি। আবার শুরু করলেন বলতে, 'আর নিষ্কাম কর্ম
ধ্যানের চেয়েও বড় সাধন। তাই তো নরেন আমার নিষ্কাম কর্মে
পত্তন করলে।'

কত ভক্ত আসে। কত রকম তাদের জিজ্ঞাসা। কত না নালিশ
এক ভক্ত বলে পাঠাল আমার মন কেন স্থির হয় না ?

মা শুনেই চটে গেলেন, 'রোজ পনেরো বিশ হাজার করে জ
করতে পারো, তা হলে হয়। আমি দেখছি, নিশ্চয়ই হয়। আগে
করে দেখ, না হয় তখন বলবে। তবে একটু মন দিয়ে করতে হ
তাতো নয়, কেউ করবে না, কেবল বলবে, কেন হয় না ?'

আর একটি ছেলে এসে বললে, 'আর জপ টপ করে কি হবে ?'

শ্রীমা প্রশ্ন করলেন, 'কেন ?'

ছেলেটি বিজ্ঞের মত বলল, ‘করলুম অনেক, কিছু হল না। কাম ক্রোধ আগেও যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। মনের ময়লা একটুও কাটেনি।’

মধুর উপদেশ দিলেন শ্রীমা, ‘বাবা জপ করতে করতেই কাটবে। না করলে চলবে কেন? পাগলামো করো না। যখনি সময় পাবে, তখনই জপ করবে।’

কিন্তু যিনি জপের ঊর্ধে, তার আবার জপ কেন? শ্রীমাকে বললেন এক ভক্ত, ‘তোমার তো সব হয়েই গেছে, কেন শুধু শুধু শরীরকে কষ্ট দিচ্ছ?’

মা বললেন, ‘বাবা, আমার ছেলেরা কে কোথায় কি করছে না করছে, তাদের জন্য কিছু করে রাখছি।’

রাতে একটু ঘুম নেই চোখে। মায়ের কথায়, ‘কি করে ঘুমোব বাবা। ছেলেগুলো সব এসে পড়েছে, নিজেরা কিছুই করতে পারে না, তাই তাদের কাজেই রাত কাবার।’

এক ভক্তকে মা নির্দেশ দিলেন, ‘তোমাকে আর জপ করতে হবে না।’

ছেলের জপ করতে বড্ড কষ্ট হয়। তাই মা নিজেই নিলেন সে দায়িত্ব।

ছেলেটি করুণ কণ্ঠে বলল, ‘মা আমার সব কেড়ে নিলেন? আমি একেবারে কি রসাতলে যাবো।’

অভয়দায়িনী দিলেন অভয়, ‘কার সাধ্য আমার ছেলেকে রসাতলে নিয়ে যায়।’

‘তবে আমার এখন কি কাজ?’

মা বললেন, ‘সব ছেড়ে দে আমার ’পর। নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক।’

এক স্ত্রীলোক দীক্ষার জন্য ধরল মাকে। মা বললেন, ‘বেলুড় মঠে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আছে তাদের কাছে মন্ত্র নাও গে যাও।’

কিন্তু মহিলা নাছোড়বান্দা, 'মা তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় পাবো এই ভরষা নিয়ে বেরিয়েছি বাড়ী থেকে। কোনো দিকে তাকাইনি। ধার কর্জ করে এসেছি। এখন তুমি যদি 'না' বলো তবে কোন্ মুখে, কোন্ প্রাণে আমি ফিরে যাবো বাড়ীতে!'

কিন্তু মা নির্মমের মত বললেন, 'আমি পারবো নি বাপু।'

মহিলার অন্তরে লাগল বেদনার ছোঁয়া। চোখের পাতা ভিজে গেল। কেঁদে কেঁদে গাইতে লাগলো গান। মা পারলেন না আর নিজেকে ধরে রাখতে, ছুটে এলেন ঘর থেকে। বললেন 'বোস মা। তোর গানে যে আমি পূজো ভুলে গেছি। এবারে আদেশ কর মা, আমি পূজো করতে বসি। এই যে প্রসাদী পান খা। তোর মুখখানা শুকিয়ে গেছে।'

করুণাময়ীর অন্তর গলে গেল। ধার্য হল দীক্ষার দিন। পরম আনন্দে মহিলাটি ফিরল ঘরে।

মায়ের শরীরটা কয়েকদিন যাবৎ বেশ খারাপ যাচ্ছে এত শ্রম যেন আর সয়না। সারা দিনই কাজ নিয়ে থাকতে হয়। ভক্তরা আসে সব ছেলে মেয়ে ওরা। মা তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন দেখাশোনা করেন। সারাটা দিন ঐ করেই শেষ। সারা দিন ঠাকুরকে ঘিরে কত ভক্ত। দেখা সাক্ষাৎ নেই। মনটা কেমন করে শুধু মাঝে মাঝে শোনেন ঠাকুরের কণ্ঠস্বর। প্রাণ জুড়িয়ে যায় সারাটা মন প্রশান্ত হয়। দরমার দরজার ফাঁকা দিয়ে কখনোবা ঠাকুরকে একটু দেখবার চেষ্টা করেন। তাঁর জন্য চেপে চেপে বেড়ে দেন ভাত। সুযোগ পেলে গিয়ে কাছে বসেন। বলেন—এটা খাও ওটা খাও। আর দুটো ভাত খাও ইত্যাদি।

দুধ বেশী দিলে যদি না খান ঠাকুর, তাই ঘন করে জ্বাল দেন

শ্রীমা। সবই বোঝেন ঠাকুর। তাইতো একদিন বললেন ঠাকুর, 'রামলালের খুড়ী না থাকলে কে এমন করে রেঁধে খাওয়াতো?'

শ্রীমা অসুস্থ হলে ঠাকুরের কি উৎকণ্ঠা। রামলালকে ডেকে শুধালেন ঠাকুর, 'ওরে রামলাল, আবার মাথা ধরল কেনরে?'

কেনইবা ব্যস্ত হবেন না। ঠাকুর যে মায়ের পরম রূপটি করেছেন দর্শন। তাইতো মা কোনো খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেই ঠাকুরের মুখে উচ্চারিত হয়। 'মা ব্রহ্মময়ী, মা ব্রহ্মময়ী।'

একদিন ঘটল এক কাণ্ড। ঠাকুব আনমনে মাকে লক্ষ্মী মনে করে বললেন, 'দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস!'

তাকিয়ে দেখেন লক্ষ্মী নয় সারদা। ঠাকুর বিনয়ী হলেন, 'তা তুমি মনে কিছু করোনি তো? আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী, তাই বলেছি ভেজিয়ে দিয়ে যাস, তুমি কিছু মনে করোনি তো?'

এতেই মন প্রশান্ত হলনা ঠাকুরের। পরের দিন এসে বলতে লাগলেন শ্রীমাকে, 'ছ্যাখ, সারারাত ভেবে ভেবে আমার ঘুম হয়নি, কেন এমন রুক্ষ কথা তোমাকে বলে ফেললুম!'

ঠাকুরের শরার বেশ কিছু দিন ধরে খারাপ চলছিল। কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন এসে বললেন—জল বন্ধ করতে হবে।

—সে কি গো! জলের আর এক নাম জীবন যে। তাকে ছেড়ে দেহ কি করে থাকে!

গঙ্গাপ্রসাদ বললেন—বেশ থাকা যায়। রোগ হলে সব মেনে চলতে হয়।

ভাবনায় পড়লেন ঠাকুর। ডাকালেন সারদাকে। বললেন, 'হ্যাঁগো, পারব জল না খেয়ে?'

অভয় দিলেন অভয়দাত্রী। বললেন আবার ঠাকুরকে, 'তা মা কালী যেমন করবেন। যথা সাধ্য তাঁর ইচ্ছায় হবে।'

জল বন্ধ হল। দুধ এল। প্রথমে অর্ধসের। তারপরে একসের

থেকে পাঁচ ছ' সের। মা ঘন করে জ্বাল দেন অনেক দুধ। পুরু সর পড়ে। তুলে ধরেন ঠাকুরের সামনে। ঠাকুর ব'ল, 'কত দুধ ?'

মা বলেন, 'কত আর হবে ? একসের পাঁচ পো !'

ঠাকুর বলেন, 'না এ অনেক। এই যে পুরু সর পড়েছে।'

মা কোনো পাত্তা দিলেন না সে কথার। সবটুকু দুধই খাওয়ালেন। কিন্তু আর একদিন গোপাল-মাকে জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর, 'হ্যাঁগা, কত দুধ হবে বল তো ?'

গোপাল-মা গোপন করতে পারলেন না সত্য। ঠিক ঠিক বলে দিলেন। ঠাকুর চমকে উঠলেন—'এ্যাঁ, এত দুধ! তাই তো আমার পেটের অসুখ হয়। ডাকো, ডাকো—'

শ্রীমা এলেন। ঠাকুর বললেন, 'কত দুধ ?'

'কত আর সামান্য।'

'তবে যে গোপাল-মা বলে, এত ?'

'ও জানে না।'

একটু থেমে আবার বলেন শ্রীমা, এখানকার মাপ গোপাল-মা জানবে কি ? এখানকার ঘটিতে কত দুধ ধরে সে জানবে কি করে ?'

আবার মাকে ডেকে বললেন ঠাকুর, 'বাটিতে কত দুধ ধরে ? ক'ছটাক, ক'পো ?'

এবারে মায়ের মেজাজ সারদার, 'ক-ছটাক, ক-পো, অত জানিনে। দুধ খাবে, তা ক-ছটাকের ঘটি, ক-পো, অত কেন ? অত শত হিসেবে দরকার কি !'

সন্দেহ ঢুকল ঠাকুরের মনে। পেট সত্যিই সেদিন খারাপ হল। মা একটু রুষ্টা হলেন। গোপাল-মা অনুতাপে জ্বলে জ্বলে বলতে লাগলেন, 'তা আমায় বলে দিতে হয়। আমি কি অত জানি ? আমি ভাবলুম সত্যি কথা বলাই হয়ত ঠিক হবে।'

মা বললেন, 'খাওয়ার জন্যে মিথ্যে বললে দোষ নেই। তাই দেখনা, আমি ভুলিয়ে টুলিয়ে খাওয়াই—'

গোপাল-মা এবারে বললেন, 'তাহলে দেখছি মনেই সব।'

মা বললেন, 'নিশ্চয়ই। না বললে এমনি বেশ খেতেন। হজম করে ফেলতেন। যেই শুনলেন, অমনি খুঁত খুঁত ভাব। সেইটি খারাপ হল।'

সারদার সেবা যত্নে ঠাকুরের শরীর একটু ভাল হল। বেশ খুশী খুশী ভাব। মাঝে মাঝেই ছুটে আসেন শ্রীমার কাছে। বলেন, 'দেখ, তোমার হাতের রান্না খেয়ে কেমন চেহারা ফিরেছে আমার।'

লক্ষ্মীর সঙ্গে একদিন গুণগুণ করে গান গাইছিলেন শ্রীমা। কেমন করে যেন ঠাকুর শুনে ফেললেন তা। পরের দিন শ্রীমাকে দেখেই বলে উঠলেন 'কাল যে তোমাদের খুব গান হচ্ছিল? তা বেশ বেশ ভালো।'

লজ্জা পেলেন শ্রীমা। 'তুমি আবার তা শুনলে কখন? কিছু করার সাধ্যি নেই। বাপু, সর্বজ্ঞ হয়ে সব খবর নিয়ে বসে আছ, বলতো যাই কোথায়!'

রসের ঠাকুর রসিকতা করলেন সারদার সঙ্গে।

সেদিন ঠাকুরের ভাত নিয়ে আসছিলেন শ্রীমা। এমনি সময়ে একটি মেয়ে এসে বারিয়ে দিল দুখানা হাত। বললে—দাও মা, আমি খাবারটা দিয়ে আসি।

মা থালা খানা দিলেন তার হাতে। মেয়েটি ঠাকুরের সামনে ভাত দিয়েই গেল পালিয়ে। মা বসে বসে হাওয়া করতে লাগলেন ঠাকুরকে। কিন্তু ঠাকুর বললেন, 'আমি খেতে পাচ্ছিনা। জানো না ও কে?'

মেয়েটি ভাল নয়। মা তা জানতেন। তাই বললেন, 'জানি।'

ঠাকুর বললেন, 'তবে কেন তুমি না এনে ওর হাতে দিয়েছ আমার ভাতের থালা? ওর ছোঁয়া আমি খাই কি করে?'

কাতর মিনতি নিবেদন করলেন শ্রীমা, 'আজকে খাও!'

ঠাকুর এবারে বললেন, 'তবে বলো, আমার খাবার কোনো দিন আর কারু হাতে দেবেনা?'

ক্ষণকাল গম্ভীর হয়ে থেকে মা পাখাটি রাখলেন। হাতজোড় করে বললেন, 'সেটি আমি পারবোনি। কেউ আমার কাছে মা বলে চাইবে আর আমি তা দেবনা, এমনটি হবেনি কখনো! তুমি তো আমার একলার ঠাকুর নও, তুমি সকলের। তবে, তুমি যখন বলছ, তোমার খাবার আমি নিজেই আনবার চেষ্টা করব।'

এমন একটা কথা পেয়ে তবে ঠাকুর হাত দিলেন ভাতে।

আজকাল খাবার নিয়ে যায় গোপাল-মা। কোনো অভিযোগ নেই এর বিরুদ্ধে। এর শুদ্ধ দেহ। সিদ্ধ আধার। খাবার খাবেন ঠাকুর। তা নয়তো গোপাল-মা কে নিয়ে মিলিয়ে বসবেন গল্পের আসর। ওদিকে ভাত নিয়ে বসে থাকেন মা। আর দেখা নেই যেন গোপাল-মার।

একদিন বিরক্তি ভরে বললেন মা, 'খাবার বেড়াল, কুকুরে খায় খাক, আমি আর আগলাতে পারব না।'

কথাটা গেল ঠাকুরের কানে। তাই বললেন ঠাকুর গোপাল-মাকে, 'এতক্ষণ থেকো না। ওর কষ্ট হয়।'

কিন্তু গোপাল-মার বিশ্বাস অখণ্ড। তিনি জোড় গলায় ঠাকুরকে শুনিয়ে দিলেন, 'না, মা আমাকে খুব ভালোবাসে। মেয়ের মতন ডাকে আমার নাম ধরে।'

কিন্তু গোপাল-মা নবতে না এলে যে খেতে বসতে পারেন না শ্রীমা। তাই তো এখন তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন। খেতে বসেন দুজনে। তার পরে সারাদিনের শ্রম-ক্লান্ত দেহটি এলিয়ে দেন শয্যায়।

॥ তেরো ॥

পানিহাটির উৎসবে সবাই যাবে।

যাবে স্ত্রী-পুরুষ এক সঙ্গে। মধ্যমণি হবেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। পরমহংসের ফৌজ যাবে মহোৎসবের শ্রীবৃদ্ধি করতে।

একজন স্ত্রী ভক্ত এসে জিজ্ঞেস করল ঠাকুরের কাছে, 'মা কি যাবেন আমাদের সঙ্গে ?'

ঠাকুরের মুখে নির্দ্বিধার উত্তর, 'ওর ইচ্ছে হয় তো চলুক।'

এ যেন একরকম অসম্মতের সম্মতি দান। মা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলেন ঠাকুরের মনের কথা। তাই সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'অনেক ভিড় হবে। অত ভিড়ে আমার দেখা হবে না কিছু। আমি যাবনা।'

উৎসব থেকে ফিরে এসে বললেন ঠাকুর, 'ও না গিয়ে ঠিকই করেছে ও অশেষ বুদ্ধিমতী। ও বুঝে-সুঝেই যায় নি, চায় নি যেতে। এমনিতেই ভক্তের দল যখন যায় তখন লোকেরা বলে পরমহংসের ফৌজ চলেছে। এখন ও যদি সঙ্গে থাকত, বলত—ঐ দেখ হংস-হংসী।'

হৃদয়কে একদিন বললেন ঠাকুর। 'তুই আমাকে হেনস্তা করছিস কর। কিন্তু ওকে, তোর মামীকে যেন করিসনে। আমার মধ্যে যে আছে সে যদি ফনা তোলে হয়তো বেঁচে যেতে পারিস। কিন্তু ওর মধ্যে যে আছে সে যদি একবার মাথা তোলে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরেরও সাধ্য নেই তোকে বাঁচায়।'

মা আমাদের সত্যিকারের সবার মা। স্নেহময়ী করুণাময়ী মা।

এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এল মায়ের কাছে। নিভৃতে বসল দুজনে। করল কতনা গল্প। কিন্তু ঠাকুরের ভাল লাগলনা তাকে। মনে মনে একটু বিরক্ত হলেন। কারণ মহিলার চরিত্র মোটেই ভাল ছিল না। তাই সারদাকে ঠাকুর বলেই ফেললেন,. 'আমার ইচ্ছা নয়, ও আসে।'

কিন্তু সারদার অন্য ভাব। তিনি যেন বলতে চান—'তুমি পিতা হয়ে কলঙ্কিনী কন্যাকে ত্যাগ করতে পারো। আমি মা, আমি পারব না সন্তানকে হেলায় ফেলায় দূরে ঠেলতে।' ঠাকুর হার মানলেন শ্রীমার কাছে।

বাবুরামের থালায় রুটি দেখে ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'ক খানা ?'

বাবুরাম বললে—'পাঁচ খানা।'

ঠাকুর প্রশ্ন করলেন—'কেন ?'

বাবুরাম বলল—'আমি তো কিছু জানিনে। মা দিয়েছেন।'

ছুটে গেলেন ঠাকুর মায়ের কাছে, 'তুমি কি বেশি বেশি খাইয়ে ছেলেগুলোর আখের মাটি করবে।'

করুণাময়ী সারদামণি হেসে ফেললেন, 'সামান্য দুখানা রুটি বেশি খেয়েছে বলে তোমার ভাবনা! তোমার কিছু ভাবতে হবে না। ছেলেদের ভাবনা আমি ভাবব। আমাকে ভাবতে দাও। দুখানা রুটি বেশি খেয়েছে বলে আমার ছেলেকে তুমি বোকো না।'

ঠাকুর আর কি বলবে। মায়ের ছেলে। মায়ের চিন্তা কারো থেকে কম নেই। ওদের সব দায় দায়িত্বের বোঝা মা স্বেচ্ছায় বহন করেছেন।

এসেছে এক মাড়োয়ারী ভক্ত। নাম লক্ষ্মীনারায়ণ। ঠাকুরের বিছানাটার পানে তাকিয়ে তার মনটা গেল খারাপ হয়ে। এমন ময়লা বিছানায় অমন প্রাণের ঠাকুর ঘুমায়! না এ হতে দেবনা আমি।

লক্ষ্মীনারায়ণের মনে অহমিকার উদ্রেক হল! সে বলল, 'আমি দশ হাজার টাকা লিখে দেব। তার সুদে তোমার সেবা চলবে।'

• ঠাকুর প্রতিবাদ করলেন, 'অমন কথা মুখেও এনোনা। যদি বল, তবে আর এসোনা এখানে।'

মাড়োয়ারী বিস্ময়ে অভিভূত। এত সহজে দশ-হাজার টাকা কেউ কি প্রত্যাখ্যান করতে পারে?

ঠাকুর আবার বলতে লাগলেন, 'আমার টাকা ছোঁয়ার জো নেই, কাছেও রাখবার জো নেই। ও তুমি ফিরিয়ে নাও।'

মাড়োয়ারী এবারে করল অন্য চিন্তা। মনে মনে ঠিক করল হৃদয়ের কাছে রেখে যাবে টাকা। কথাটা বলল ঠাকুরের কাছে। এবারেও ঝলসে উঠলেন ঠাকুর, 'খবরদার! ওকে দিলে আমাকেই টাকার তদারক করতে হবে।'

এমনি একটা মুহূর্তে এসে উপস্থিত হলেন জননী সারদা। ঠাকুর একটা মস্ত পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিলেন তাঁকে! কিন্তু কে কাকে করছে পরীক্ষা। প্রকৃতি নিয়ে খেলা। বিশ্ব-মন যিনি ধরে আছেন, পরিচালনা করছেন, তাঁর মন নিয়ে পরীক্ষা! খবরটা শুনলেন সারদা।

কি সে খবর?

—মাড়োয়ারী তোমাকে দশ হাজার টাকা দিতে চায়।

মা একটু স্মিত হেসে বললেন, যা তিনি নিতে পারলেন না, তা আমি নিই কি করে? আমার নেওয়া যে তারই নেওয়া হবে। ঐ টাকা যখন তাঁর সেবায় লাগবে তখন তো তাঁরই নেওয়া হল।

সারদামণির কথা শুনে ঠাকুর পেলেন পরম তৃপ্তি—এই না হলে সর্বত্যাগিণী হওয়া যায় না।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন সারদা।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি।

হঠাৎ লাগল ঠাকুরের ঠাণ্ডা। উঠল গলা ব্যথা হয়ে। বেশ ফুলেছে গলা। তার উপরে খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম। সঙ্গে চলেছে কঠোর পরিশ্রম। শরীরের দিকে মোটেই নজর নেই। রোগটা বেশ পাকাপাকিভাবেই দেহে আশ্রয় নিল। কিছু দিনের মধ্যেই গলায় গেল ঘা হয়ে। বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন ঠাকুর। গলা দিয়ে এখন রক্ত পড়ে। কথা বললে রোগ যায় আরো বেড়ে।

ভক্তদের ভাবনার শেষ নেই। কি যে হবে! ভক্তরা ঠাকুরকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এলো শ্যামপুকুর। শ্রীমাকেও আনা হল। তিনি নানা অসুবিধার মধ্যে ঠাকুরের রান্নাবান্নার দায়িত্ব নিলেন। সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রম। ঠাকুরের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে তবে বিশ্রামের প্রত্যাশা। তার আগে একটুও বসেন নি শ্রীমা। আবার রাতের এক প্রহর থাকতেই উঠে পড়েন। সেবার বিরাম নেই। বিরাম নেই প্রার্থনার—ওঁর শরীর ভালো করে দাও ঠাকুর।

দীর্ঘ আড়াইটা মাস এমনি ধারাই কেটে গেল। রোগের উপশম হল না কিছুই। মায়ের মনটা ভাল না। ভক্তরাও সবাই উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে করে দিন যাপন।

ঠাকুর হেসে একদিন বলতে লাগলেন মাকে, 'যারা লাভের আশায় এসেছিল তারা সব চলে গেল, যাচ্ছে। বলছে, উনি অবতার, ওঁর আবার ব্যারাম কি? ও সব মায়া। কিন্তু যারা আমার আপনার জন, তাদের আমার এ কষ্ট দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে।'

শ্যামপুকুরে ভক্তরা খুবই চিন্তার মধ্যে দিন কাটাতে লাগল। অবস্থা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত। ক্রমে ক্রমে বেশীর দিকেই যেতে লাগল। কিন্তু সে দিকে যেন কোন ভ্রুক্ষেপ নেই ঠাকুরের।

১৮৮৬ র ১লা জানুয়ারী। গৃহীভক্তদের স্পর্শ করলেন ঠাকুর।

জাগিয়ে দিলেন তাদের ঘুমন্ত শক্তিকে। চেতনার আকাশে নিক্ষিপ্ত করলেন মহাশক্তির তনুভা। বললেন ঠাকুর, 'দেবতার চৈতন্য হোক।'

নানা দর্শনের আনন্দে ভক্তবৃন্দ আবিষ্ট রইল সারাদিন। পেল দেবদেবীর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য। কিন্তু সর্বনাশের দরজাটা সেদিন থেকে একেবারেই গেল উন্মুক্ত হয়ে। রোগের দাপট পৌঁছল গিয়ে অবাধ্যতায়।

মায়ের চোখে জল এলো। আশার দিগন্তটায় শুধুই অন্ধকার। একটু আলো নেই। একটু আশা নেই। চিকিৎসায় ধরে না। মনটা ভেঙ্গে পড়ল মার। তবুও একবার শেষ চেষ্টায় মা চলে গেলেন বাবা তারকনাথের থানে তারকেশ্বরে। পড়ে রইল হত্যা দিয়ে তিন দিন তিন রাত্রি। কিন্তু কি পেলেন?

পেলেন মর্মান্তিক দৈববাণী, 'কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী।'

ফিরে এলেন মা। ঠাকুর শুধালেন, 'কি গো কিছু হল?'

নীরব জননী। ঠাকুর নিজেই আঙ্গুল নেড়ে জবাব দিলেন, 'কিছুই না।'

দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাকান যায় না ঠাকুরের পানে। নাক, চোখ, মুখ সব বসে গিয়েছে। কঙ্কালসার দেহ। কেবল রক্ত আর রক্ত। গলা বেয়ে বুঝি দেহের সব রক্তগুলোই বেরিয়ে যাবে।

একটুও খেয়াল নেই ঠাকুরের। নিজের চিন্তা থেকে একেবারে মুক্ত হয়ে গিয়েছেন ঠাকুর। ভাসছেন পরম আনন্দ লহরে। কখনো বা নিজের পানে ইঙ্গিত করে বলছেন, 'এর ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত লয়ে লীলা করছেন। যখন ঐ অবস্থা প্রথম হল, তখন জ্যোতিতে দেহ জ্বলজ্বল করত। বুক লাল হয়ে যেত। তখন বললুম, 'মা, বাইরে প্রকাশ হয়ো না, ঢুকে যাও। তাই এখন এই হীন দেহ।' মাঝে মাঝে মা গলা পরিষ্কার করছেন পলতে দিয়ে। ঠাকুর বলছেন, 'উহুঁ, কি করছ? মা বললেন 'পলতে দিচ্ছি?' 'আচ্ছা দাও!'

নীরবে সব সয়ে যাচ্ছেন। নিচ্ছেন পরমা প্রকৃতির সেবা যত্ন। পূর্বের কথার রেশ টেনে আবার বলছেন, 'সে রকম জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে লোকে জ্বালাতন করত। ভিড় আর কমত না। এখন বাইরে কোন প্রকাশ নেই। এতে আগাছা পালায়, যারা শুদ্ধ ভক্ত তারাই কেবল থাকবে। এই ব্যারাম হয়েছে কেন? এর মানে ঐ। যাদের সকাম ভক্তি, তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে।'

চিন্তায় ভাবনায় শ্রীমার শরীরও দুর্বল। একদিন পড়ে গেলেন মাথা ঘুরে। আঘাত লাগল পায়ের গোড়ালিতে। শয্যা নিতে হল। মনটা গেল আরো খারাপ হয়ে। এমনি দিনে একদিন ঠাকুর বলে বসলেন, 'শেষবারের মত তোমার হাতে খাব।'

মার বুকের মধ্যে হুঁ হুঁ করে আছড়ে পড়ল এসে খ্যাপাগঙ্গার ঢেউ। আর আশা নেই। সব শেষ হয়ে এসেছে। বুকের মধ্যে যেন শুনতে পেলেন শ্রীমা বিদায়ের পদধ্বনি। ঠাকুর বুঝতে পারলেন মায়ের মনের অবস্থা। তাই বললেন একদিন কাছে ডেকে, 'আমার শরীরটা চলে গেলে তুমিও যেন শরীর ছেড়ে চলে যেও না। শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়। ঈশ্বরকে ভুলে অন্যায় কাজ করে লোকগুলো সব পোকার মত কিলবিল করছে, কত দুঃখ ভোগ করছে। তুমি তাদের দেখবে, কেমন করে ঈশ্বরকে ডাকতে হয় শেখাবে, শক্তি দেবে, ভক্তি দেবে। দুজনে এক কাজ করতে এসেছিলেম, আমি কি করেছি—তার অনেক বেশি তোমাকে করতে হবে, তুমি আমার বাকী কাজ পূর্ণ কোরো।'

আটটি মাস হল অতিক্রান্ত। মর্মন্তুদ বেদনার মধ্য দিয়ে কেটে গেল দিনগুলো। উৎকণ্ঠার অন্ত রইল না। মর্মবেদনার পীড়ায় অস্থির ভক্তগণ নিরাশার বালু বেলায় দাঁড়িয়ে অসহায়ের মত প্রত্যক্ষ করতে লাগল অস্তাচলগামী সূর্যকে।

সহসা একদিন ঠাকুর চাইলেন একখানা পঞ্জিকা। পড়তে বললেন। এক সময়ে বললেন থামতে। চিহ্নিত হয়ে গেল যাবার দিনটি।. সকলের বুকের মধ্যে গর্জন করে উঠল শোকের সমুদ্র। বুঝতে আর বিলম্ব হলনা—বিদায়ের দিন আসন্ন।

১২৯৩ সাল।

শ্রাবণের ৩১ শে। রবিবার। গভীর রাত। এখন কটা বাজে? একটা প্রায়। চাঁদের উজ্জল স্নিগ্ধ প্রভা ম্লানিমার স্পর্শে নিস্প্রভ। পরার তিতিক্ষায় চোখ স্তব্ধ শান্ত অপলক। নেই গঙ্গার বুকে ঘন গমক। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসের মত ভেসে আসে উজান উচ্ছ্বাস।

মা পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝবেন না কেন? তাঁর সব কাজ কর্মে ঘটতে লাগল অনর্থ। খিচুড়ি রাঁধছিলেন, ধরে গেল। ছাদে কুঞ্জদার দেওয়া কাপড়টা ছিল, তা গেল চুরি হয়ে। অমঙ্গলের চিহ্নগুলো স্পষ্ট. হয়ে উঠল তাঁর সকল কাজে। মায়ের মনের শেষ আশার প্রদীপের ক্ষীণ রোসনাইটিও হল নির্বাপিত। ঠাকুর রাত একটায় মগ্ন হলেন মহাসমাধিতে।

কেউ কিছু বুঝতে পারল না। রাত ভোর হল। শরীরে এখনো বেশ উত্তাপ। মুখে মাখা তৃপ্তির সুধাবিন্দু। সবাই সচেষ্ট সমাধি ভাঙ্গতে। ঠাকুরের দিব্য দেহ ঘিরে নাম কীর্তন করতে লাগল ভক্তবৃন্দ—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে! হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে!

শ্রীমা সকালে এলেন ঠাকুর ঘরে। অপলক দৃষ্টি। চোখ ফেটে কান্না এলো। হাহাকার করে উঠলেন এক সময়ে, 'আমার মা কালী, কোথায় গেলে গো?'

অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন শ্রীমা। সব শেষ হয়ে গেল। মহাযোগী মহাধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন চিরদিনের জন্য।

মহাপুরুষদের বাক্য—'বিদেহী অবস্থায় আরো কাছে কাছে থাকি।'

সত্যি তাই। মা তখন কামারপুকুরে। দেখলেন, একদিন ঠাকুর এসে বলছেন, 'খিচুড়ি খাওয়াও।'

সে দিনের সেই পোড়া খিচুড়ির বিস্বাদ বুঝি লেগে ছিল ঠাকুরের রসনায়। ভক্তের নিবেদিত বস্তু, পোড়া হলেও গ্রহণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ভালো করে খিচুড়ি রেঁধে ভোগ লাগালেন শ্রীমা।

এবারে খুলতে হবে এয়োতির বেশ ও বাস। পরতে হবে বৈধব্যের শুভ্র বসন। ভাঙতে হবে হাতের শঙ্খ। মুছতে হবে ললাটের সিন্দুর বিন্দু।

হাতের বালা খুলতে যাচ্ছিলেন শ্রীমা। ঠাকুর এসে ধরলেন হাতখানা চেপে, 'ও কি করছ? আমি কি কোথাও গেছি? এঘর থেকে ও ঘর।'

বৃন্দাবনে তীর্থ করতে এলেন শ্রীমা। এখানেও একদিন চেষ্টা করলেন হাতের বালা খুলতে। অমনি এসে ঠাকুর হাজির, 'তুমি হাতের বালা ফেলো না। আজ বিকেলে গৌরমণি আসবে। তার কাছে জেনে নিও বৈষ্ণব তন্ত্র।'

ঠাকুরের নির্দেশে এলেন গৌরমণি। শ্রীমাকে একে একে সব দিলেন বুঝিয়ে। দূর করলেন তাঁর মনের ভ্রম। আত্মার বিনাশ নেই, ও যে অবিনশ্বর। বদলায় শুধু দেহটা।

॥ চৌদ্দ ॥

দেখতে দেখতে একটা সপ্তাহ হ'ল অতিক্রান্ত। ঠাকু:রর পূত অস্থির কৌটা বলরাম বসুর বাড়িতে দিয়ে আসা হল। মা এলেন। তা থেকে কিছুটা নিয়ে সমাধিস্থ করা হল জন্মাষ্টমীর পুণ্যদিনে রামবাবুর কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে।

কিন্তু এ ব্যাপারটা নিয়ে গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে একটু মন কষাকষি দেখা দিল। মা মনে মনে দুঃখ পেলেন। আক্ষেপ করে গোপাল-মার কাছে বললেন, 'এমন সোনার মানুষই চলে গেলেন, দেখছ গোপাল-মা এখন ছাই নিয়ে ঝগড়া।'

নানা ঝামেলায় মা অসহ্য যন্ত্রণা সইছিলেন। তাই আর দেহ ধরে রাখতে চাইছেন না, 'কি হবে এত কষ্ট করে? চলে যাই তাঁর কাছে।'

বিষণ্ণ মনের দিগন্তে বিদায়ের ছায়াপাত! ভক্তদের মনে হল ভীতির সঞ্চার। তাই মাকে নিয়ে যাত্রা করল বৃন্দাবনে। সঙ্গে এলো যোগীন্দ্র, গোপাল-মা ও লক্ষ্মী। দেওঘর, কাশী ও অযোধ্যা হয়ে পৌঁছলেন এসে বৃন্দাবনে। কিন্তু বৃন্দাবনের প্রতিটি রজরেণু-দেহ চুইয়ে পড়ে বিরহের অশ্রু। এখানে এসে মায়ের কান্না গেল আরো বেড়ে। ঠাকুর থাকতে পারলেন না আর। সেই দিব্য-ঘন-তনু শ্রীরামকৃষ্ণ এসে বললেন শ্রীমাকে, 'এত কান্না কেন? আমি কি কোথাও গেছি গা!'

ঠাকুরের দর্শন লাভ করে মা হলেন অনেকটা আশ্বস্ত।

আর একদিন এসে মাকে বললেন ঠাকুর, 'তুমি যোগীন্দ্রকে দীক্ষা দাও।'

এবারে বৃন্দাবন থেকে যাত্রা করলেন মা হরিদ্বারে। ব্রাধাকুণ্ডে বিসর্জন দিলেন ঠাকুরের নখ ও কেশ। হরিদ্বার থেকে জয়পুরে। জয়পুর থেকে আজমীর। শেষে প্রয়াগ-সঙ্গমে স্নান সমাপন করলেন মা। চলে এলেন আবার কলকাতায়। উঠলেন এসে বলরাম বসুর বাড়িতে। কয়েকদিন মাত্র রইলেন। তারপর গোপাল-মাকে নিয়ে চলে এলেন কামারপুকুরে। একমাস থেকে গোপাল-মা চলে এলেন। শ্রীমার জীবনের প্রেক্ষাপটে সূচিত হল আর একটি নতুন অধ্যায়ের। শ্বশুরের শূন্য ভিটায় এই তাঁর স্থির অবস্থান।

ঠাকুর বলতেন শ্রীমাকে, 'কামারপুকুরের ভিটামাটি একেবারে ছেড় না। সেখানে থাকবে, শাক বুনবে, শাক-ভাত খাবে, আর ভগবানের নাম করবে।'

অতীত এসে যেন কথা কয়ে যায়। তাই তো সর্বত্যাগিনী শ্রীমা এসে আশ্রয় নিলেন শূন্য মন্দিরে।

বাইরের অভাব, অনটন, দুঃখ কষ্ট এখন আর তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি এখন সদা আনন্দময়ী। অন্তরে তাঁর নিরন্তর দর্শনের নৈকট্য। এমনি দিনে মায়ের সঙ্গে এসে মিশলেন গৌরদাসী। বেশ কাটছে দিনগুলো দুজনার।

কিন্তু শ্যামাসুন্দরী আর পারছেন না সারদাকে একা ফেলে রাখতে। তিনি চাইলেন মেয়েকে জয়রামবাটীতে নিয়ে আসতে। গেলেন সেখানে। কিন্তু বেশী দিন রইলেন না। আবার চলে এলেন কামারপুকুরে। এবার মাকে নিয়ে আসা হল কলকাতায়। যোগানন্দ স্বামী মায়ের সেবায় করলেন আত্মনিয়োগ।

বলরাম বোসের বাড়িতে থাকতেন মা। বিকেলে একদিন উঠেছেন ছাদে বেড়াতে। ওদিকে গিরিশ ঘোষ ও তাঁর স্ত্রীও উঠেছেন তাঁদের বাড়ির ছাদে। গিরিশের স্ত্রী বললেন, 'ঐ দেখ, ও বাড়ির ছাদে মা বেড়াচ্ছেন।'

গিরিশ মায়ের নাম শুনেই দাঁড়ালেন পেছন ফিরে। বুজলেন চোখ। বললেন, 'না-না, আমার পাপ নেত্রে এমন করে দেখবনা মাকে লুকিয়ে।' বলতে বলতে গিরিশ ছুটে নেমে এলেন নীচে।

এই গিরিশই একদিন ধরে ছিলেন ঠাকুরকে চেপে—আমার ঘরে আসতে হবে তোমাকে পুত্র হয়ে। বল, আসবে?

ঠাকুর বলেছিলেন, 'হ্যাঁ বয়ে গেছে আবার তোর ছেলে হয়ে জন্মাতে।'

ঠাকুরের তিরোধানের চার বছর পরে গিরিশের হল একটি পুত্র। তাঁর বিশ্বাস, আমার ঠাকুরই এসেছেন। তাই ঠিক ঠাকুরের মত দেখতে লাগলেন ছেলেকে! সব তার স্বতন্ত্র। এমনকি বাটি, ঘটি, রেকাব, সব কিছুই। এক দিন ছেলে বায়না ধরল।

কি?

আঙ্গুল ধরে টানছে আর মুখে 'উ—উ' শব্দ করছে। মানে, উপরে চল। মাকে দেখবে। কারো সে খেয়াল হলনা। অবশেষে কে যেন দিল মনে করিয়ে। ছেলেকে নিয়ে একদিন আসা হল মায়ের কাছে। কি আশ্চর্য! মাকে দেখা মাত্র কোল থেকে নেমে পড়ল অবুঝ ছোট্ট ছেলে। ছুটে এলো মায়ের কাছে। শুয়ে পড়ল এসে শ্রীমায়ের পায়ের 'পর। তাজ্জব কাণ্ড! শুধু কি কেবল তাই? নিচে নেমে গিরিশের হাত ধরে লাগল টানতে। নিয়ে আসবে তাঁকে উপরে। অবশেষে গিরিশ হার মানলেন বাল-গোপালের কাছে। বলতে লাগলেন করুণকণ্ঠে, 'ওরে আমি মাকে দেখতে যাব কি ক'রে? আমি যে মহাপাপী।'

কি কান্না গিরিশের।

সে কান্না কে দেখে। কোন কথা নয়। দ্বিধা নয়। মায়ের কাছে ছেলের আবার পাপ কি? ছেলের পাপ ধুয়ে কোলে টেনে নেবেন স্নেহময়ী জননী। তার কাছে তোমাকে যেতেই হবে।

উপায়হীন গিরিশ। ছোট্ট ছেলের হাত ধরে দুরু দুরু বক্ষে এসে উপস্থিত হলেন শ্রীমার কাছে। বললেন ছেলেকে দেখিয়ে গিরিশ, 'মা, এ হতেই শ্রীচরণ দর্শন হল আমার।'

চার বছরের শিশু মাতৃদর্শন করাল পিতাকে। ভেঙ্গে দিল মনের সব দ্বন্দ্ব। মুছিয়ে দিল সব আবিল। মাতৃ-দর্শনের চোখ দান করল।

কয়েকটা দিনের জন্য শ্রীমা এসেছেন কলকাতায়। মাষ্টার মশাইয়ের বাড়িতে থাকেন তিনি। আবার কখনো কখনো বাড়ি ভাড়া করে চলে আসেন গঙ্গার তীরে। কামারপুকুরে আট মাসের মত থেকে কলকাতায় চলে এলেন বলরাম বোসের বাড়িতে। বেশ স্থানটি। ছাদে বসে ধ্যান করেন মা। বেশ তন্ময়তা আসে। একদিনের একটি ঘটনা মা বিবৃত করলেন—যোগীন-মার কাছে, 'দেখলাম যেন কতদূরে চলে গেছি, সকলেই আমাকে ভালবাসছে, কি রূপ আমার! ঠাকুরও রয়েছেন। সকলে কি যত্নে আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে দিল! কি আনন্দ হচ্ছিল, সে আর ভাষায় বলতে পারিনা। যখন মনে নেমে এল—দেখলাম শরীরটা পড়ে রয়েছে। ভাবছি কি করে ওটার ভেতরে ঢুকব? খানিক পরে শরীরে চেতনা ফিরে এল।'

বোধগয়ার একটি মঠ মায়ের খুব ভাল লাগল। তিনি মনে মনে ঠাকুরের কাছে নিবেদন করলেন, 'ওগো, আমার ছেলেদের জন্য যদি অমনি একটি স্থান করে দাও, তাহলে অন্নাভাবে, আশ্রয়াভাবে তাদের আর কষ্ট পেতে হবে না।'

গয়াধামে বসে আরজি পেশ করলেন ছেলেদের জন্য ঠাকুরের কাছে শ্রীমা। এলেন কলকাতায়। উঠলেন এসে নীলাম্বর বাবুর বাড়িতে। বেশ মনোরম পরিবেশ। গঙ্গার তীরে বেলুড়ের ধারে। এখানে ধ্যানে বেশ মন বসত শ্রীমার। কিছুদিন এখানে থেকে যাত্রা করলেন পুরীধামে। সঙ্গে সঙ্গী হলেন গোপাল-মা, যোগীন-মা ও লক্ষ্মী। আরো কয়েকজন ত্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিল। এরা সব বাইরের সঙ্গী। কিন্তু অন্তরের সঙ্গী করলেন শ্রীমা ঠাকুরকে। একেবারে প্রত্যক্ষ। জাগ্রত যেন। তাই তো মায়ের উপলব্ধি 'ছায়া কায়া সমান।'

যার ছায়া তারই তো কায়া। ঠাকুর কোনো দিন পুরীধামে যাননি। তাই মা জগন্নাথ ধামে আসার আগে নিয়ে এলেন আসন থেকে ঠাকুরের একখানা ছবি। পুরীতে নামলে পাণ্ডারা এলো এগিয়ে। পাল্‌কিতে করে নিয়ে যেতে। কিন্তু মা বললেন, 'না বাবা, আমি দীন হীন কাঙ্গালিনীর মতই তাঁকে দর্শন করতে যাব।'

চার মাস পুরীধামে প্রভুর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে থেকে আটপুর ও তারকেশ্বর হয়ে ফিরে এলেন কামারপুকুরে। একবছর পরে কামার-পুকুর থেকে এলেন কলকাতায়। উঠলেন মাষ্টার মশাইর বাড়ীতে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই পরমভক্ত বলরাম হয়ে পড়ল অসুস্থ। মা চলে এলেন বলরাম ভবনে। মায়ের পায়ে মাথা রেখে বলরাম বোস হলো চিরনিদ্রায় নিদ্রিত।

ভক্তের বিয়োগ বেদনা মাকে চরমভাবে আঘাত করল। মায়ের কোলে সন্তানের মৃত্যু! মায়ের মন একেবারেই পড়ল ভেঙ্গে! আর দেহে থাকতে চাইলেন না। শোক দগ্ধ মন নিয়ে চলে এলেন ঘুঁসুড়িতে। নরেন এলেন একদিন। যাবেন তিনি আমেরিকায়। মাকে এসেছেন প্রণাম করতে। গান শোনালেন নরেন। বললেন মায়ের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে, 'মা যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি, তবেই আবার আসব। নতুবা এই-ই।'

মায়ের বুকে কথাটা আঘাত করল, 'সে কি?'

নরেন পড়ল মহাবিপাকে, 'না না, আপনার আশীর্বাদে শিগ্‌গিরই আসব।'

এবারে মা তাঁর অন্তর উজাব করে আশীর্বাদ করলেন নরেনকে।

মাযের আশীর্বাদ পূত জীবন। তাই নরেন সক্ষম হলেন জগৎ জয় করতে। তাই তো তিনি গাজিপুর থেকে গুরুভাইদের লিখলেন, 'মাতাঠাকুরাণীর যে প্রকার ইচ্ছা হইবে, সেই প্রকারই করিবেন। ...আমি কোন নরাধম তাঁহার সম্বন্ধে কোনও কথা কহি?... মাতাঠাকুরাণী যদি আসিয়া থাকেন, আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন ও আশীর্বাদ করিতে বলিবেন, যেন অটল অধ্যবসায় হয়, কিংবা এ শরীরে যদি তাহা অসম্ভব, যেন শীঘ্রই ইহার পতন হয়।'

কন্যাকুমারিকায় নরেন দর্শন করলেন ঠাকুরকে। নরেন মাদ্রাজ থেকে মায়েয় আশীর্বাদ চেয়ে পত্র দিলেন। মা করলেন আশীর্বাদ। বিশ্ববিজয় করে নরেন ফিরে এসে বললেন, 'মায়ের আশীর্বাদেই একলাফে হনুমানের মত সাগর ডিঙ্গিয়েছি। মায়ের কৃপা আমার'পর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষগুণ অধিক।'

কিন্তু মায়ের ক্রন্দন আর থামে না। স্মৃতির দহনে মাঝে মাঝেই পড়েন ভেঙ্গে। এমনি দিনে একজন সন্ন্যাসীর ছায়ামূর্তি বললেন মাকে, 'পঞ্চতপা কর। শান্তি পাবে।'

বৈশাখ মাসে পঞ্চতপা করলেন শ্রীমা।

লোকেরা বললে—'মা পঞ্চতপা করলেন কেন?'

মা বললেন, 'পার্বতীও পঞ্চতপা করেছিলেন শিবের জন্য।'

পঞ্চতপা করে মায়ের মনের দহন কিছুটা হল প্রশমিত। ফিরে এলো শান্তির শান্ত স্পর্শ অন্তর মন জুড়ে।

বলরাম বোসের স্ত্রীর কান্না আর থামে না। স্বামীহারা হয়ে পাগলিনীর মত হয়ে গেছেন তিনি। মাকে পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন তিনি।

এরপরে আটপুরে ভক্তদের দুর্গোৎসবে গিয়ে যোগ দিলেন শ্রীমা। পূজো হয়ে গেল। মা তার ভাই ও মাকে নিয়ে চলে এলেন কাশীধামে। সেখানে রইলেন দু-একদিন। আবার চলে এলেন সেই শ্যাম-শান্ত বৃন্দাবনে। দেখতে দেখতে কেটে গেল তিনটি মাস। এবারে ফিরে যাবার পালা। কিনলেন একটি 'বাল-গোপাল' শ্রীমা। সেটিকে নিয়ে যাত্রা করলেন ঘরের পথে। কিন্তু গোপাল বন্দী রইল বাক্সে।

বন্দী গোপাল আর যেন পারল না থাকতে নীরব। শ্রীমাকে স্বপ্নে বললেন তাই, 'তুমি আমাকে এনে ফেলে রেখেছ, খেতে দাওনি, পূজো করনি। তুমি পূজো না করলে আমাকে কেউ পূজো করবে না'।

মা ঘুমের মধ্যে লাফিয়ে উঠলেন। ক্ষমা প্রার্থনা করলেন গোপালের কাছে। বাক্স থেকে গোপালকে নামালেন। পূজো করলেন। দিলেন পরম যত্ন করে খেতে। রাখলেন ঠাকুরের পাশে। এই গোপালই এখন মার সুখ দুঃখের সঙ্গী। ওকে নিয়েই মার দিন রাত কেটে যায়।

দীর্ঘ বারো বছর হল ঠাকুর চলে গেলেন। যত দিন যায়, ততই তাঁর প্রচারের সৌগন্ধ পড়ে আদিগন্তে ছড়িয়ে। মহিমময় জীবনের বার্তা লোকে লোকান্তরে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। বরানগর থেকে আলম-বাজারে মঠ উঠে এল। নরেন ফিরে এসেছেন। হয়েছেন বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। পাশ্চাত্যদেশকে সে বাণী করেছে মুগ্ধ। বহুলোক হয়েছে আকৃষ্ট। দিকে দিকে পড়ে গেছে সাড়া। স্বামীজি বেলুড়ে পত্তন করলেন রামকৃষ্ণ-মঠ।

এলো শ্যামাপূজার পুণ্য দিন। স্বামীজি মাকে নিয়ে গেলেন মঠে। সঙ্গে গুরুভাতৃগণ আছেন। সবাই মিলে মাকে নিযে 'মঠের' নতুন জমির চারিদিকে ঘুরে এলেন। পরম স্নেহময়ী সন্তান-দের কল্যাণ প্রার্থনায় বসলেন। ঠাকুরের পূজো করলেন নিজের হাতে। এমন পুণ্য লগ্নে নিবেদিতা এসে হাজির হল অপরাহ্ণ বেলায়। মাকে নিয়ে গেল বোসপাড়ায়। মা স্থাপিত করলেন বালিকা বিদ্যালয়ের ভিত।

যোগানন্দ মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। মায়ের সেবাদাস যোগানন্দ। বোসপাড়ায় যোগানন্দকে নিয়ে মা আছেন ভাড়াটে বাড়িতে। যোগানন্দের হাতে পয়সা পড়লেই জমা করে রাখে। বলে, 'মায়ের তীর্থদর্শনে লাগবে।'

কিছুদিন পরে যোগানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়ল। মায়ের কোলে মাথা রেখে ত্যাগ করল শেষ নিঃশ্বাস। মা চোখের জল মুছলেন আঁচলে

এবারে মায়ের সেবার দায়িত্ব পড়ল সারদানন্দের উপর। মা তাকে ডাকেন শরৎ বলে। কিছুদিনের জন্য মায়ের সেবা করে-ছিলেন ত্রিগুণা তীতানন্দ।

এদিকে স্বামীজি মঠে দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছেন। আনন্দের বাজার মিলল। এমন আনন্দের দিনে আনন্দময়ীকে না আনলে

মানায়? তাই মাকে নিয়ে আসা হল মঠে। পরম আনন্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত হল মঠের পূজো। স্বামীজি মাকে মনে করেন সাক্ষাৎ জগজ্জননী। অথচ তাঁরই একটা নিশ্চিত আবাস নেই। তাই তো স্বামীজি উপস্থিত গুরুভাইদের বললেন, 'জ্যান্ত দুর্গামাকে যেদিন বসিয়ে দেবে, সেদিন আমি হাফ ছেড়ে বাঁচব।'

কিন্তু মায়ের কি আর স্বস্তি আছে? একতো ছেলেদের চিন্তা। তার উপরে ভাইদের তাণ্ডব। একজনও শিখল না লেখা পড়া। কেবল স্বার্থ চিন্তা। ভগবানে বিন্দু মন নেই। দিদির কাছে কেবল দাবী আর আব্দার। মা সব বোঝেন। তাইতো দুঃখ করে বলেন, ''এত লোক এখানে কষ্ট স্বীকার করে কি জন্য আসে, তা কি ওরা একটুও বোঝে না? সর্বদা টাকা কড়ি চায়, কখনো ভুলেও জ্ঞান ভক্তি চাইলে না।'

আবার কখনো কখনো ক্রোধের বশে বলতেন, 'ওদের মা বাপের পুণ্যেই ওদের দিদি হয়ে জন্মেছি।'

এত সব বলা সত্ত্বেও অভয়কে ভুলতে পারেন না মা। মায়ের ছোটভাই। মায়ের নেওটা। মা পড়াচ্ছিলেন তাকে মেডিকেল স্কুলে। আসক্তি শূন্য করবেন বলেই হয়তো মাকে আবার চরম আঘাত হানলেন ঠাকুর। অভয়ের হল কলেরা। অভয় মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে হল পরাভূত। যাবার প্রাক্কালে মায়ের পানে করুণ নয়নে তাকিয়ে বলল, 'দিদি, এরা রইল, তুমি দেখো।'

মা একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। অভয়ের স্ত্রী সুরবালা ছিল সন্তান সম্ভবা। স্বামীর মৃত্যু তাঁকে উন্মাদ করে দিল। অভয় চলে গেল বটে, কিন্তু সুরবালার দায়টা দিয়ে গেল দিদির 'পর। তাকে সামলাতেই মাকে এখন ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু আর যেন ব্যথার ভার বইতে পারছেন না মা। পাত্তাড়ি গুটোবার জন্য তৈরী করতে লাগলেন মন। এমনি দিনে ঠাকুর এসে দেখা

দিলেন ছোট্ট একটি মেয়ের হাত ধরে। বললেন মাকে, 'এ যোগমায়ার অংশে জন্মগ্রহণ করেছে, তোমার মন সংসারে বেঁধে রাখতে।'

কিছুদিনের মধ্যেই একটি মেয়ে হল সুরবালার। মেয়ের নাম রাখা হল রাধারাণী। ঠাকুর আবার এসে দেখা দিয়ে বললেন মাকে, 'এই সেই মহামায়া' একে অবলম্বন করে তুমি আরও কিছুদিন পৃথিবীতে থাকো।'

রাধু মায়ের প্রাণপ্রতীম হয়ে উঠল।

এক ত্যাগী ভক্ত বললে একদিন মাকে—'রাধুর 'পর তোমার বড্ড আসক্তি।'

মা বললেন, 'কি করব বাবা, আমরা মেয়ে মানুষ, আমাদের এই রকমই।'

পরে রাধু সম্বন্ধে মা বলতেন, 'শুদ্ধ মন যখন যেটা ধরে তো ষোল আনা ধরে। বিদ্যুৎ যখন চমকায়, শার্শিতেই চমকায়, কিন্তু ঘর বাড়িতে কিছু হয় না।'

এই রাধুকে কেন্দ্র করেই মার যত চিন্তা। রাধুই মার পরম ও চরম আকর্ষণ এখন। কেউ কেউ বলে এই টান যেদিন ফুরাবে, মায়েব ভব যন্ত্রণাও সে দিন জুড়াবে। মা আর থাকবেন না সেদিন।

॥ পনেরো ॥

অনেক দিন হল মা গিয়েছেন দেশে। কলকাতার ভক্তদের মন করে উঠল আঁকুবাঁকু। সারদানন্দ চলে এলেন শ্রীমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে।

বাগবাজারের এক ভাড়া বাড়িতে উঠলেন মা। স্বামী সারদানন্দ রইলেন মায়ের সঙ্গে। আর ভাবনা নেই। মায়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করছেন আমেরিকার এক ভক্ত মহিলা মিসেস ও লিবুল। বুল স্বামীজির শিষ্যা।

এক বছর পরে মা পুরীর পথে যাত্রা করলেন। সঙ্গে মাষ্টারমশাই, প্রেমানন্দ, লক্ষ্মী এবং গোপাল-মা গেলেন। মার বাড়িরও কেউ কেউ গেল।

কিছুদিন পুরীতে থেকে মা ফিরে এলেন কলকাতায়। মার খুড়ো-মশাইও গিয়েছিলেন। তিনি এসে পড়লেন অসুস্থ হয়ে। জীবনের আশা নেই। মা তাঁর কাছেই বসে থাকেন সর্বক্ষণ। কেবল পূজোর সময়ে ওঠেন। সেদিন অনেক অনুরোধ করে মাকে পাঠান হল খেতে। অনিচ্ছা, তবুও অনুরোধে যেতে হল তাঁকে। কিন্তু এদিকে খুড়ো মশাই বিদায় নিলেন। কথাটি গোপন রাখা হ'ল। কারণ মা শুনলে তাঁর খাওয়া নষ্ট হবে। খাওয়া শেষে মা হাহাকার করে উঠলেন, 'তবে কি, তবে কি খুড়ো নেই? কেন তোমরা আমাকে ও ছাই পাশ খেতে পাঠালে? একবার শেষ দেখাটিও দেখতে পেলুম না।'

কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন মা। এগিয়ে গেলেন খুড়োর দিকে। নাম

জপ করে দিলেন মাথায় ও বক্ষে। শবদেহ নেওয়া হল কাঁধে। তার মধ্যে ছিল একটি কায়স্থ ছেলে। সেও কাঁধ দিল। এ দৃশ্য গোলাপ-মার সহ্য হল না। তিনি বললেন, 'শুদ্দুর হয়ে ছুঁলে বামুনের মরা ?'

মা প্রতিবাদ করলেন। মধুর শিক্ষা দিলেন সংস্কারে আবদ্ধ ভক্তদের, 'শুদ্র কে? ছেলে? ভক্তের কি জাত আছে গোলাপ ?'

এক ভক্ত এসে বললে মাকে, 'মা ভগবানের যদি কৃপা হয় তখন তো আর সময়ের বাদবিচার করে না। যাকে বলে, আলটপকা এসে পড়ে। অসাধ্যও সুসাধ্য হয়ে যায়।'

মা বললেন, 'তা বটে, কিন্তু কালের মত মিষ্টি হয় কি? মানুষ অকালে ফলাবার চেষ্টা করছে। আশ্বিন মাসেও তো আম মেলে কিন্তু জষ্টি মাসের মত মিষ্টি হয় কি? ইশ্বর লাভের পথও তেমনি। এজন্ম হয়তো জপ-তপ, পরের জন্ম ভাব, তার পরের জন্ম সমাধি—এই ভাবে আর কি।'

ক্ষণকাল নীরব থেকে আবার বললেন, 'তাই বলি। নদীর কূলে বসে ডাকো, সময়ে তিনি পার করবেন।'

এমনি দিনে শ্রীমার জননী শ্যামাসুন্দরী দেহ রাখলেন। একের পর এক দুঃখের মঞ্জুষা পান করে চলেছেন শ্রীমা নীরবে।

শোকে দুঃখে মায়ের শরীর পড়ল দুর্বল হয়ে। ধরল ম্যালেরিয়ায়। ওদিকে গিরিশ তাঁর বাড়িতে আয়োজন করেছে দুর্গাপূজার। মাকে জানিয়েছেন আমন্ত্রণ। কিন্তু মন ভাল না তাঁর। মায়ের অসুখ! তিনি কি আসতে পারবেন পূজোয় ?

সন্তান কাঁদলে মা কি থাকতে পারেন ? গায়ে জ্বর নিয়েই করতে লাগলেন যাতায়াত। কিন্তু সন্ধিপূজো হবে মহানিশায়। এত রাত্তিরে মায়ের আসা অসম্ভব। সংবাদটি শুনলেন গিরিশ—তাঁর মন গেল ভেঙ্গে, 'মা-ই যদি না আসেন তো পূজো হবে কার ?'

ভক্তের প্রাণে জাগল আকুল কান্না। মাতৃহীন মাতৃপূজা। কি হবে এ করে যদি মা-ই না এলেন! মা, মাগো! আয়, একবার দেখা দে!

দরজার 'পর ছুটো শব্দ হল। রাত তখন গভীর। অন্ধকার চতুর্দিকে। এমন নিশিথ রাত্রির গভীর যামে কে এসে আঘাত করে ছুয়ারে?

উৎকর্ণ হল সবাই। আবার শব্দ। এবারে শুধু শব্দ নয়, শুনতে পেলেন পরম ভক্ত গিরিশ মায়ের কণ্ঠ, 'আমি এসেছি, দরজা খোল।'

মা তুই এত করুণাময়ী। গিরিশ মাতৃমূর্তি দর্শন করে পড়লেন ধ্যানস্থ হয়ে। জ্যান্ত দেবীর পূজো হল। ফুল চন্দনে চরণ চর্চা করল গিরিশ শ্রীমার। সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন ভক্ত।

গিরিশ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি রকম মা?'

মা বলেছিলেন, 'এ শুধু গুরু-পত্নী নয়, পাতানো মা নয়, সত্যিকারের মা।'

সত্যিকারের মা বলেই তো ছেলের কান্নার অশ্রু মোছাতে ছুটে এসেছেন গভীর রাত্রে। পাতানো মার কর্ণে কি পৌঁছায় বিশ্ব-সন্তানের ক্রন্দন।

শ্রীমার ভাইদের মধ্যে বেশ মনোমালিন্য, জমে উঠল। মা সারদানন্দকে বললেন, ওদের ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিতে। হলও তাই। কিন্তু এখন মা থাকবেন কার কাছে? মা বললেন, 'ছুদিন এ ঘরে, ছুদিন ও ঘরে—এই ভাবেই আমার দিন কেটে যাবে।' শ্রীমার ভাইদের আলাদা করে দিয়ে সারদানন্দ মহাচিন্তা নিয়ে ফিরলেন কলকাতায়। আসবার দিন প্রার্থনা করলেন মায়েরই কাছে—'মা, তোর মন্দির নির্মানের একটুকরো মাটি মিলিয়ে দে মা।'

মা মঞ্জুর করলেন বুঝি ভক্তের প্রার্থনা। 'খড়ো' কেদার একফালি জমি দান করল; সারদানন্দ সেখানে তৈরী করল বাড়ি। ভক্তদের

কাছে এ বাড়িটি পরিচিত হয়ে উঠল মায়ের বাড়ি বলে। অবশ্য কেউ কেউ একে 'উদ্বোধন' ও বলত। সারদানন্দের তত্ত্বাবধানেই এখান থেকে বেরোত 'উদ্বোধন' পত্রিকা। তাই লোকে মায়ের বাড়িটিকে 'উদ্বোধন' অফিস বলে জানত।

দোতলায় থাকেন মা। পাশে ঠাকুর ঘর। সারদানন্দের পরম তৃপ্তি। মায়ের জন্য তৈরী করেছেন একটি স্থায়ী আবাস। আর এঘর ওঘর করতে হবেনা তাঁকে। সারদানন্দ থাকেন ছোট্ট একটি ঘরে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে—'আপনি এত ছোট্ট ঘরে থাকেন কেন?'

সারদানন্দ বলেন, 'আমি মায়ের দারোয়ান।'

আর মা বলেন, 'শরৎ আমার ভারী। শরৎ না হলে আমার বোঝা আর কে নিতে পারে?'

কলকাতায় পাঁচটি মাস অতিবাহিতহল শ্রীমার। এলেন জয়রাম-বাটিতে। একবছর রইলেন। আহ্বান এলো বালেশ্বর থেকে। বলরাম বোসের জমিদারী বালেশ্বরের কোঠারে। রামেশ্বর যাবার পথে নামলেন কোঠারে। বেশ ভালো লাগল স্থানটি। দু'মাস রইলেন এখানে। মাকে দেখে কোঠারের দেবেন চাটুজ্জের ঘটল রূপান্তর। দলে পড়ে খৃষ্টান হয়েছিলেন। যাতায়াত করতেন খৃষ্টান চক্রে। চার্চে যেতেন। প্রেয়ার করতেন। কিন্তু মাকে দর্শন করে সব যেন কেমন উলটে গেল। মনটা আঁকুবাঁকু করে উঠল। স্ব-ভাবে ফিরে আসবার জন্য আকুল হল মন। মায়ের কানে কে যেন তুলল দেবেন চাটুজ্জের কথা। মা দিলেন অনুমতি। চাটুজ্জে জপ করলেন গায়ত্রী মন্ত্র। ধারণ করলেন যজ্ঞোপবীত। দাঁড়ালেন এসে নত মস্তকে মায়ের সমীপে। মা কাছে টেনে নিলেন ছেলেকে। কানে রাখলেন শক্তি মন্ত্র। পরম ভাগ্যবান দেবেন চাটুজ্জে পেলেন দীক্ষা। প্রসাদ স্বরূপ

একখানা কাপড় দিলেন দেবেনের হাতে। খুশীতে ভরে গেল তাঁর অন্তর।

মায়ের কাছে আকুল কান্না নিবেদন করতে পারলেই হ'ল। অমন শক্তিশালী মন্ত্র আর কি আছে? ব্যাকুল কণ্ঠে মা-মা বলে ডাকো। তিনি তোমার সর্বকালের সুখ-দুঃখে সঙ্গিনী হয়ে থাকবেন।

কান্না আর কান্না। কান্না যদি অন্তরে জেগে ওঠে তবেই মা এসে তোমার সর্বসন্তাপ দেবেন বিদূরিত করে।

মাদ্রাজে এলেন শ্রীমা। সেখানে কয়েক দিন থেকে চলে এলেন মাদুরায়। এখানে রয়েছে শিব ও মীনাক্ষীর মন্দির। লোকেরা একে বলে 'সুন্দর'। 'সুন্দরের' পাশে এক বিরাট সরোবর। নাম শিবগঙ্গা। মা শিবগঙ্গায় স্নান করলেন। জ্বেলে দিলেন একটি দীপ। এটা এদেশের প্রথা। সর্বত্রই দেবমন্দিরে ভরে আছে। একের পর এক ঘুরে ঘুরে দেখলেন শ্রীমা। এলেন রামনাদে। এখানে মার এতটুকুও অসুবিধা হল না। কারণ রামনাদের রাজা ছিলেন স্বামীজির শিষ্য। তাই রাজা তাঁর রাজ্যের কর্তৃপক্ষের কাছে লিখে পাঠালেন, 'আমার গুরুর গুরু এসেছেন; সর্বপ্রকারে তাঁর পূজাকার্যে সাহায্য করবে।'

লোকে লোকারণ্য। স্বামীজির গুরু-মা। স্বয়ং দেবী এসেছেন। তাঁকে দেখা যে পরম পূণ্যের কাজ। মাদ্রাজের মাটি তৈরী করেছেন স্বামীজি। এই মাদ্রাজকেই সর্বপ্রথমে স্বামীজি শুনিয়ে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মধুমাখা বাণী। তাইতো এত লোকের জমায়েত। তাদের মধ্যে কেউ আবার দীক্ষা প্রার্থী।

এবারে মা এলেন রামেশ্বরে। শশি মহারাজ করেছেন পূজোর ব্যবস্থা। একশতটি সোনার বেলপত্র গড়িয়েছেন শশি। পূজো হবে তাই দিয়ে।

মন্দিরে ঢুকলেন মা। এবারে গঙ্গোত্রীর পূত পবিত্র বারি সিঞ্চন করা হবে মুকুট সরিয়ে। অপলকে তাকিয়ে আছেন জননী সারদা।

ক্ষণ বিরতি। বললেন একসময়ে, 'তোমাকে যেভাবে রেখে গিয়েছিলাম এ দেখছি তেমনটিই রয়েছ তুমি।'

কথাটা কানে গেল গোলাপ-মার। ঝুঁকে পরে অমনিই শুধালে গোলাপ-মা, 'কি বললে মা?'

সঙ্গে সঙ্গে মুখে কপাট পড়ল শ্রীমার। গোলাপ-মা তাকিয়ে রইল অপলক। কি দেখছে সে?

দেখছে মহাশক্তির মহাপ্রকাশ। এই আদ্যাশক্তির প্রকাশ ঘটেছিল ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের পাশে। আবার ইনিই শ্যাম-বিরহিণী রাধায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন দ্বাপরে। তাঁরই মহাপ্রকাশ এবারে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম মর্ত্ত-তীর্থ দক্ষিণেশ্বরে সারদামণি রূপে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'ও রূপ ঢেকে এসেছে। কিন্তু সাজতে গুজতে ভালোবাসে।'

বাসবেনা কেন? এ যে সর্বরূপের ঘনীভূত প্রতিমূর্তি। অঙ্গে যার এত রূপ তিনি সাজবেন না তো কি। সারদা সারাৎসার্। ও মূর্তি দর্শনে, চিন্তনে যে ইষ্টাসক্তি জন্মে। ও চরণ বন্দনে ছিন্ন হয় সর্ব বন্ধন। চর্ম চোখে দেখলে তিনি মানবীর প্রসন্ন প্রতিমূর্তি। কিন্তু মানস নেত্রে তিনি পরমা প্রকৃতি দেবী প্রতিমা। এ যে সেই রূপ ঢাকা রূপ।

রামেশ্বর থেকে আবার ফিরে এলেন শ্রীমা মাদ্রাজে। প্রতীক্ষায় অধীর ভক্তবৃন্দ। তারা মাকে নিয়ে যাবে বাঙ্গালোরে।

কিন্তু মা যে তাদের কথা কিছুই বোঝেন না। তারা বুঝতে পারেন না মায়ের কথা। তা হোকনা? প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা—এরতো কোনো আঞ্চলিক ভাষা নেই। সেখানে এক ভাষা। এক কান্না। সেই কান্নার কুসুম দিয়ে ধুয়ে দেব তোমার চরণ যুগল। প্রাণের ভাষায় কথা কব তোমার সঙ্গে। মাদ্রাজী সন্তানেরা রাশি রাশি পুষ্প নিয়ে পূজো করতে বসে গেল মাকে। লাভ করল

মায়ের প্রাণ ঢালা ভালোবাসা ও মমতা মধুর তৃপ্তির সুধা সিন্ধু।' আশীর্বাদ করলেন মা ওদের।

সেখান থেকে ফিরে শ্রীমা স্নান করলেন পুণ্যতোয়া গোদাবরীতে। এলেন পুরীধামে। অল্প কয়েক দিনের বিরতি। ফিরে এলেন কলকাতায়।

রাধু বেশ বড়ো হয়ে গিয়েছে। বয়স হয়েছে বারো বছর। এবারে বিয়ে দিতে হয়। সবাইকে নিয়ে মা চলে এলেন জয়রামবাটিতে। রাধুর বিয়ে হয়ে গেল।

জয়রামবাটি থেকে বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে যাতায়াতের সুবিধার জন্য নির্মিত হয়েছিল একটি আশ্রম—কোয়ালপোতায়। মা এলেন এখানে। ঠাকুরের ফটোর পাশে এনে বসালেন নিজের ফটো। করলেন পূজো। দর্শকবৃন্দ দেখে তো অবাক! একি অপূর্ব লীলা! কিন্তু এর রহস্য কি ?

আত্মপূজা করলেন মা আত্মদর্শন করে। আমিই সেই শ্রী, হ্রী।

নিজের পূজো নিজে করে শেখালেন জীবকে প্রকৃত অর্চনার পদ্ধতি। আত্মদর্শন মানে স্বরূপ দর্শন। সেই একরূপ একমূর্তি। একই খণ্ড বিশ্বের ঘনীভূত মূর্তি। ঠাকুরও অনুরূপ পূজো করেছিলেন একদা। বলেছিলেন, 'কালে ঘরে ঘরে এই মূর্তি পূজিত হবে।'

এত আশ্বাস, এত অভয়, তবুও মন নির্ভয়ের বন্দরে পোতাশ্রয় নির্মান করতে দ্বিধাগ্রস্ত।

এক ভক্ত এসে মাকে বলল, 'আপনাকে রেখে ঠাকুর আগেই চলে গেলেন কেন ?'

মায়ের কণ্ঠে স্পষ্ট উত্তর ফুটে উঠল ফুলের মতন, 'মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য এবারে আমাকে রেখে গেছেন।'

উপসংহারটি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মা তাঁরই সুবিন্যস্ত বিন্যাস।

করেছেন বীজ বপন। সারদা করবেন অঙ্কুরিত বীজে জল সিঞ্চন

এ সত্যটি বুঝেও মন অবুঝ হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। • উদ্বোধনে জনৈক সেবক মায়ের ঘব ঝাঁট দিতে দিতে ভাবছিল, 'এ কার সেবা করছি, কেন করছি? ইনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিধবা স্ত্রী বৈ আব কিছু নন তো?'

মাতৃ অন্তর ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে, 'আমি মা, জগতের মা, সকলের মা—বুঝবি, বুঝবি, কালে বুঝবি।'

ভক্তটি বিস্ময়ে হতবাক।

'তুমি না হয় আমাদের মা, কিন্তু সকলের মা কি করে? তুমি কি এইসব পশুপাখী, কীট-পতঙ্গ এদেরও মা?'

মা বললেন, 'ওদের মায়ের ভিতর দিয়ে আমি ওদেরও মা; এজন্মে ওরা এইভাবেই আমার স্নেহ যত্ন পেয়েছে।'

বাড়িতে একটা বেড়াল ছিল। বড় উৎপাত করে। কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই। কারণ বেড়ালটি মায়ের বড় প্রিয়। বড় আদরের।

কিন্তু মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে। তখন কেউ কেউ বেড়ালকে ছেড়ে মাকে নিয়েই পড়ে। দুচার কথা শোনাতেও করেনা কসুর।

মা সইতে পারলেন না আর জ্বালাতন। মনে মনে বেশ অভিমানের মেঘ জমল। লাঠি নিয়ে তেড়ে গেলেন বেড়ালকে—আয়, আজই শেষ করে দেব তোকে।

কোথায় বেড়াল পালাবে তা নয়, একেবারে এসে মাথা গুঁজে দিল মায়ের পায়ের তলায়। শুধু কি তাই? একেবারে লুটিয়ে পড়ল পূর্ণ আত্মসমর্পণ। মা এবারে হেসে ফেললেন, 'কি করে মারি বল দেখি—যে ভাবে ও আশ্রয় নিয়েছে।'

সঙ্গীরা হেসে উঠল, 'যাক, তোমাকে আর মারতে হবে না। ও-ও বুঝে নিয়েছে তোমাকে।'

জয়রামবাটিতে ছিল একটি টিয়া। সে বলে, 'মা, ও মা!'

মাকে দেখলে নাচতে শুরু করে দেয়। সেদিন পূজোয় বসেছেন মা। টিয়া তো ডেকে ডেকে আকুল 'মা, ও মা!'

কোনো রকম পূজো সেরে উঠে পড়লেন মা, বলতে লাগলেন, 'কি জ্বালা! একটু ধীরে সুস্থে পূজোটাও করতে দিবিনা?'

দক্ষিণ ভারত থেকে একটি ছেলে এসেছে দীক্ষাপ্রার্থী হয়ে। জানে না সে বাঙলা। একজন দোভাষী আছে দুজনার মধ্যে। মা বললেন, 'ওকে ওর মাতৃভাষায় যা বলবার বলতে দাও।'

সব কথাগুলো শুনলেন মা। বলতে লাগলেন বাঙলায় কথা। উভয়ের মধ্যেই বোঝাবুঝির পালা সাঙ্গ হল। ভাবের আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে মা টেনে নিলেন সন্তানকে আরো কাছে। তখন আর কিছুই রইলনা অপরিজ্ঞাত। দীক্ষা হয়ে গেল ছেলেটির।

ছেলেটি সব বুঝে নিল সহজ ভাবে। অন্তরের ভাষার বিস্তার তো অনন্ত। সেখানে বোঝাবুঝির নেই কোনো গরমিল। যেমন চোখের জলের এক রং। তেমনি হৃদয়ের ভাষারও একই সুর। তাইতো বিদেশী ছেলেটি মায়ের অন্তরের ভাষা বুঝে নিল সহজে।

স্বামীজি নিয়ে এসেছেন নিবেদিতাকে। কোথায় থাকবে সে? বিদেশী মেয়ে। কে তাকে গ্রহণ করবে সাদরে?

মনে মনে চিন্তা করছিলেন স্বামীজি। মা দিলেন সে ভাবনার মেঘ অপসারিত করে। পরম যত্নে টেনে নিলেন নিবেদিতাকে কোলে। আদর করে সম্বোধন করলেন 'খুকী' বলে।

রোদে পুড়ে এসেছে এক ছেলে। ঘামে ভিজে গেছে দেহ। মায়ের মন গেল অস্থির হয়ে। মা শুয়েছিলেন। উঠে এলেন ত্রস্ত হয়ে। করতে লাগলেন ছেলেটিকে হাওয়া।

আর একটি ছেলে গিয়েছে কাজে। এদিকে চেপে এলো বর্ষণ। মা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন। ছেলেটি ভিজে একশা হয়ে ফিরল। মা পরম যত্নে মুছিয়ে দিতে লাগলেন তার সারা অঙ্গ।

সদ্য দীক্ষা দিয়েছেন একটি ছেলেকে। খাওয়া হলে এঁটো নিতে যাচ্ছিল সে। মা ধরলেন তার হাত চেপে, 'থাক, ও আমিই নেব।'

ছেলেটি বলল, 'তা কি হয় মা? আপনি নিলে যে আমার অকল্যাণ হবে।'

মা বললেন, 'সে কি বাছা! আমি মা, আমার কাছ থেকে কখনো অকল্যাণ হয় না। মা এঁটো পরিষ্কার করবে না তো কে করবে? মা ছেলের জন্য কত করে। আমি কি তোমার কিছু করতে পেরেছি?'

একধারে গুরু ও মা। মায়ের তুল্য কে আছে ভুবনে?

জয়রামবাটিতে এসেছে এক মুসলমান মজুর। বসেছে খেতে। ভাইঝি করছিল পরিবেশন। খাবার দিচ্ছিল তাচ্ছিল্যভরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে। মা দেখে মুখ করে উঠলেন, 'অমন করে দিলে কেউ খেতে পারে নাকি?' বলেই ভাইঝির হাত থেকে নিয়ে নিলেন খাবারের থালা। নিজেই লাগলেন পরিবেশন করতে। খাওয়ার শেষে নিলেন তার এঁটো পাতা। সবাই বলতে লাগল—'শেষে তুমি মুসলমানের এঁটো নিলে?'

মা মধুর কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'শরৎ আমার যেমন ছেলে, আমজেদও তাই।'

দীক্ষার পরে একটি ছেলে জিজ্ঞেস করল, 'কি সাধন ভজন করব মা?'

মা বললেন, 'জন্ম জন্ম সাধন-ভজন করেই তো আজ আমার কাছে এলে, আর কি সাধন ভজন করবে?'

আর একটি ছেলে বললে, 'মা, তোমার কাছে আশ্রয় পেয়েছি, আর কি জপ-তপ করব।'

ছেলেটির মধ্যে অহংকার দেখে মা বললেন, 'সে কি বাবা, ভগবান

কেমন আঙ্গুলগুলি দিয়েছেন, জপ করবে না তো কি করবে? জপাৎ সিদ্ধি।'

সারাদিনের শ্রমক্লান্তির পরে বিছানায় দেহ দিয়েও বিশ্রাম নেই মার। অবিরাম জপ চলে তাঁর।

—তোমার আবার জপ কি ?

মা বলেন, 'কত জায়গায় আমার কত ছেলে মেয়ে, তারা আজ ঠিকমত জপ করে উঠতে পেরেছে কিনা কে জানে, তাই তাদের জন্য করছি।'

দীর্ঘদিন সন্তান অদর্শনের বেদনা মা সইতে পারেন না। আপনি বলতে থাকেন, 'ওরে তোরা আয় আয়।'

আকাল নেমেছে দেশে। চারিদিকে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। তার মধ্যে আবার রাজনৈতিক নির্যাতন। মা বিচলিতা হয়ে পড়লেন। বিদ্রোহী হয়ে উঠল মন, 'এসব কি হচ্ছে?' ভয় পেয়ে গেল সকলে মায়ের করাল রূপ দেখে। তাই ভীতত্রস্ত অন্তরে সকলে প্রার্থনা করল করজোড়ে, 'মা, এভাব সংবরণ কর। সংবরণ কর।'

পাশ্চাত্য এক মহিলা মাকে চিঠি লিখেছে, 'কে তুমি, আমার প্রার্থনাকালে মেরীর স্থানে আবির্ভূতা হও ?'

নিবেদিতা বলে, 'নারীর আদর্শ সম্বন্ধে সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা।'

মা আমাদের। আমরা মায়ের। সবা'র মা সারদা। সর্বকালের, সর্ব জীবের মা। ভুবনের এমন কোন ঠাঁই আছে কি যেখানে মায়ের অঙ্ক পাতা নেই ?

ষোল

১৯১২ খৃষ্টাব্দ।

দুর্গাপূজা হয়ে গেল বেলুড় মঠে। কাশীতে যাত্রা করলেন মা। সঙ্গে এসেছেন মায়েব আত্মীয় স্বজন। সাধু ও গৃহস্থ ভক্তবাও বয়েছেন। কাশীব সেবাশ্রমেব কাছে লক্ষ্মীনিবাসে আড়াইমাস রইলেন মা। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও সাবদানন্দ এলেন এখানে। কালীপূজা হয়ে গেল। শেষ হয়েছে জগদ্ধাত্রী পূজাও। শ্রীমায়ের জন্ম তিথিও পালন করা হল এখানেই।

কলকাতায় ফিরে এলেন শ্রীমা।

দেহ ক্লান্ত। মনও ভালো নেই। শবীর একেবারে ভেঙ্গেছে। ম্যালেরিয়ায় ভুগেছেন মা দেশের বাড়িতে।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দ।

জুলাই মাস।

স্বামী প্রেমানন্দ দেহত্যাগ করলেন। বজ্র সম্পাতের মত সংবাদটা এলো মায়ের কানে। বড় ব্যথা পেলেন মা। ফলে জ্বর গেল বেড়ে। অবস্থাটা খুব ভালো মনে না করে স্বামী সারদানন্দ মাকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। দেহে আর সে জলুস নেই। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছেন। যেন চেনা যায় না।

ছেলেরা পড়ল মহভাবনায়। মা একটু হেসে বললেন, 'ভয় নেই, ভালো হয়ে যাব।'

কিন্তু জ্বর তো আর কমছেনা। ঔষধ দিচ্ছেন শ্যামাদাস কবিরাজ। চিকিৎসকের আহার নিদ্রাও মায়ের চিন্তায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

দিনরাত ভাবেন তিনি ওষুধের কথা। শ্যামাদাসের চেষ্টার বিরাম নেই। ওষুধের চেয়েও প্রার্থনার জোর অনেক বেশী। তাই কবিরাজ চোখের-জল নিবেদন করে প্রার্থনা করেন 'ও গো, তুমি ভালো হও। তুমি নিজে না ভালো হলে আমার কি সাধ্য, তোমাকে রোগ-মুক্ত করি!'

ভক্তের কান্না বুঝিবা মায়ের অন্তরে নাড়া দিল। একটু ভালো হলেন শ্রীমা। আনা হল ডাঃ নীলরতন সরকারকে। তিনি এসে বললেন, 'কালাজ্বর। ইন্‌জেক্‌শান দিতে হবে।'

দেহে অসম্ভব জ্বালা। দিন রাত আর্তি। শোনা যায়না আর। এ করুণ কাতর ক্রন্দন ভক্তদের অবিরাম কাঁদায়।

রক্ত নেই দেহে এক বিন্দু। পথ্য শুধু দুধ আর ভাত। আশা নেই। যা খেতে চাচ্ছেন মা, তাই দেওয়া হচ্ছে নির্বিবাদে।

কবিরাজ মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। য়্যালোপ্যাথিতেও ধরল না। অবশেষে আনা হল হোমিওপ্যাথি ডাক্তার জ্ঞান কাঞ্জিলালকে। এখন কাঞ্জিলালের হাতে মায়ের দায়িত্ব। নার্সকে ধমকালেন। সে ভালো সেবা করতে পারেনা। কাঞ্জিলাল দুজন নার্স পাঠাবে বিকেলে একথা বলে গেল।

মা শুয়ে শুয়ে নীরবে শুনলেন সব কথা। ডাকলেন সেই নার্সটিকে। বলতে লাগলেন কাতর কণ্ঠে, 'তুই মনে কিছু দুঃখ করিস নে সরলা। ও ডাক্তারের বাড়াবাড়ি। ও ভেবেছে আমি ঐ বুট পরা মেয়েগুলোর সেবা নেব? ও কি জানে? ভাত বেশী আনলেই আমি বেশী খেতে পারব।'

রোগে ভুগে ভুগে শিশুর মত হয়ে গেলেন মা। কথায় কথায় রাগ। কথায় কথায় অভিমান। ভাত খাওয়া একরকম ছেড়েই দিলেন। বললেন কাঞ্জিলালকে, 'কেন আমার ভাত খাওয়া নিয়ে চটে গিয়েছিলে সেদিন? তাই তো ভাত খাওয়া আমার উঠে গেল।'

জননী করুণাময়ী শেষ শয্যায় শায়িতা। ক্ষীণ কণ্ঠে একবার ডাকলেন, 'শরৎ !'

শরতের পানে মা একবার তাকালেন। অন্যসব ভক্তবৃন্দ নতমস্তকে অশ্রুঝরা নয়নে দাঁড়িয়ে। শেষ কথা কইতে লাগলেন মা শরৎকে, 'শরৎ, এবা সব রইল। আমার যোগেন, গোলাপ, আমার সকলে।'

সব শেষ। ধীরে ধীরে মাথাটি কাত হয়ে গেল। প্রাণবায়ু মহাপ্রাণের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল। হাহাকারে সমস্ত অঙ্গন ভরে গেল। লক্ষ লক্ষ সন্তান আজ মাতৃহারা শিশুর মত কাঁদতে লাগল ডুকরে।

এমন মার পায়ে যে মাথা রেখেছিল, সে কি আর ঘরে থাকে বন্ধন-ভ্রান্তির মধ্যে ? মাগো, জন্ম জন্ম যেন পাই তোমার অভয় উৎসঙ্গ। তোমার অঢেল স্নেহ-নির্ঝর। প্রণাম ! প্রণাম ! প্রণাম !